ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২

Fruit and Vegetable Cultivation-2

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৯৪১২

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. ইমরুল কায়েস

প্রফেসর ড. জসিম উদ্দিন

ড. সৈয়দ নাসির উদ্দিন

ড. মো: সাহিনুল ইসলাম

ড. মোছা আখতার জাহান কাঁকন

মো: কবির হোসেন **(প্যাডাগগ)**

আবদুল্লা আল মাবুদ (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সুচিপত্র
(নবম শ্রেণি)

প্রথম অধ্যায়
কিউকারবিটেসি গোত্রের সবজি চাষ
(Vegetable Cultivation of Cucurbitaceae Family)



আমরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৯০-১০০ গ্রাম বিভিন্ন শাকসবজি খেয়ে থাকি। বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত শাকসবজির প্রায় ৬০-৭০% উৎপাদিত হয় রবি মৌসুমে, তাই এ মৌসুমে প্রচুর পরিমানে শাকসবজি বাজারে পাওয়া যায়। বাকী সবজি উৎপাদিত হয় খরিপ মৌসুমে বিধায় এ মৌসুমে শাকসবজির প্রাপ্যতা কম। আর খরিপ তথা গ্রীষ্ম-বর্ষাকাল জুড়ে চাষ করা হয় প্রধানত বিভিন্ন ধরনের কুমড়াগোত্রীয় বা কুমড়াজাতীয় ফসল (Cucurbit crop)। কিউকারবিটেসি গোত্রের (Cucurbitaceae Family) ফসলকে কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদ বলা হয়। বাংলাদেশে অধিকাংশ কুমড়া জাতীয় সবজি বসতবাড়ির আঙিনাতে মাচায় অথবা ঘরের চালে জন্মানো হয়। এ জাতীয় সবজি নরম লতানো বর্ষজীবী এবং আরোহী। তাই স্বল্প জায়গায় চাষ করা সম্ভব। এ ফসলে আকর্ষির মাধ্যমে (Tendril) গাছ দ্রুত সামনে বা উপরের দিকে উঠতে সহায়তা দেয়। তাই নানা ধরনের ফল গাছ, বেড়া ও কাঠজাতীয় গাছে, পুকুর ও জলাশয়ের মাচায়/জাংলায়, রাস্তা ও বাঁধের প্রান্ত এবং আইলে এ সবজি চাষ হতে দেখা যায়।

এ জাতীয় সবজি শক্ত বাকলযুক্ত ফল এবং তরিতরকারি ও কাঁচা পাকা ফল হিসেবে খাওয়া হয়। খাদ্যমান ও ওজনের তুলনায় এ সবজি সস্তা ও সহজপ্রাপ্য। এর চাষ পদ্ধতি সহজ এবং বাড়তি পুঁজির প্রয়োজন হয় না। এ গোত্রের প্রায় ২০ রকমের সবজি রয়েছে। এ গোত্রের সবজির দলে আর যেসব ফল-সবজি অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, পটল, কাঁকরোল, তরমুজ, ফুটি বা বাংগি, খিরা, স্কোয়াশ এবং ঝিঙা। এসব সবজি অনাদিকাল থেকেই মানুষ আবাদ করছে। এ অধ্যায়ে এই গোত্রের ৭টি সবজির চাষ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো।

এই অধ্যায় শেষে-

- কিউকারবিটেসি গোত্রের লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, পটল ও কাঁকরোল সবজিগুলোর পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার বলতে পারবে।
- উপরোক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, উপযোগী জলবায়ু ও মাটি, বিভিন্ন জাত এবং সবজি চাষ মৌসুম সম্বন্ধে উল্লেখ করতে পারবে।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে আধুনিক পদ্ধতিতে ৭টি সবজি যেমন- লাউ, মিষ্টি কুমড়া, শসা, করলা, চিচিঙ্গা, পটল ও কাঁকরোল সবজিগুলোর চাষাবাদ এবং ফসলের আন্তঃপরিচর্যা করতে পারবে।
- উক্ত ফসলগুলো উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

১.১ লাউ (Bottle gourd)



চিত্র: লাউ ক্ষেত

লাউ বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় সবজিসমূহের একটি। বানিজ্যিক আবাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রায় পরিবারই বাড়ির আঙ্গিনা, এমনকি ছাদে এক/দুইটি লাউ গাছ লাগিয়ে থাকে। একই লাউ গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় ।

১.১.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

লাউয়ের পরিচিতি ও ব্যবহার: লাউ একটি জনপ্রিয় উপাদেয় সবজি। এটি প্রধানত: শীতকালীন ফসল। বর্তমানে এদেশে সারাবছরই লাউ হচ্ছে। লাউয়ের কচি ফল, কচি পাতা ও ডগা সবজি ও শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি শরীর ঠান্ডা রাখে। কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর, হজমে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। আমাদের প্রিয় নবী (স:) এ সবজি খেতে খুবই পছন্দ করতেন। এ দেশে লাউয়ের খোল দিয়ে বানানো একতারা একটি জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র। মাছ ধরার জাল ভাসিয়ে রাখার জন্যও লাউয়ের শুকনো খোল ব্যবহার করা হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: লাউয়ের ইংরেজি নাম বটল গোর্ড (Bottle Gourd) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *Lagenaria siceraria*

২০২৫

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম লাউয়ে আছে কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, প্রোটিন ০.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২০ মিগ্রা এবং ফসফরাস ১০ মিগ্রা ও পটাসিয়াম ৮৭ মিগ্রা। তবে কচি ডগা ও পাতার পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। এতে ফলিক এসিড, উচ্চ মাত্রার ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও আয়রন রয়েছে।

উৎপত্তি: লাউয়ের উৎপত্তি আফ্রিকা।

জলবায়ু ও মাটি: বাংলাদেশে শীতকাল লাউ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দিনের বেলায় ২৫-২৮° সে. এবং রাতের বেলায় ১৮-২০° সে. লাউ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা এটেল দো-আঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য উত্তম। লাউ চাষের জন্য মাটির উপযোগী p^H ৫.৫-৬.৮।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিপ উভয় মৌসুম।

লাউ প্রধানত শীতকালিন সবজি। তবে ইদানিং সারাবছর লাউ উৎপাদন হয় এমন লাউয়ের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। লাউয়ের উদ্ভাবিত জাতগুলো হচ্ছে-

১। বারি লাউ-১

২। বারি লাউ-২

৩। বারি লাউ-৩

৪। বারি লাউ-৪

৫। বারি লাউ-৫

৬। বর্ষা হাইব্রিড

৭। ময়না (হাইব্রিড) ইত্যাদি

জাত পরিচিতি

বারি লাউ-১: সারা বছর চাষ করা যায়। লম্বাটে ও হালকা সবুজ রংয়ের। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। চারা রোপণের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল তোলা যায়। লাউ ২-৩ দিন পর পর সংগ্রহ করতে হয়।



চিত্র: বারি লাউ-১

বারি লাউ-২: এই লাউটি চালকুমড়া আকারের ও হালকা সবুজ রংয়ের। শীতকালে আগাম ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। জাতটি মূলত শীত মৌসুমের জন্য। লাউ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করলে গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা এবং ফলন বেড়ে যায়। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন।



চিত্র: বারি লাউ-২

২০২৫



চিত্র: বারি লাউ-৩



চিত্র: বারি লাউ-৪



চিত্র: বারি লাউ-৫



চিত্র: বর্ষা হাইব্রিড

বারি লাউ-৩: আগাম শীতকালীন জাত। সবুজ রঙের ফলে সাদা দাগ থাকে। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন।

বারি লাউ-৪: তাপ সহনশীল ও অতি বৃষ্টি সহিষ্ণু এবং গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে।

বারি লাউ-৫: ফল লম্বা ও বোতল আকৃতির। ফল গাঢ় সবুজ রঙের, ফলের নিচের দিকে সাদা ছিট ছিট দাগ আছে।

বর্ষা হাইব্রিড: বর্ষাকালীন জাত। তাপ, বৃষ্টি ও রোগ সহনশীল জাত। বপনের সময় মে-অক্টোবর। প্রতিটি ফলের ওজন ২.৫-৩.০ কেজি।

ময়না (হাইব্রিড): বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। প্রায় সারা বছর ময়না লাউ চাষ উপযোগী।ময়না লাউ আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের সাদা ফোটাযুক্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি ময়না লাউয়ের গড় ওজন হয় ১.৫-২ কেজি। ময়না লাউয়ের ৩০-৩৫ টন/ একর ফলন হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত বিইউ (BU) লাউ ১ ও বিইউ (BU) হাইব্রিড লাউ ১ নামে দুইটি বারমাসি লাউ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বীজ বপনের সময়

শীতকালীন: আগষ্ট- অক্টোবর।

গ্রীষ্মকাল: ফেব্রুয়ারি- মে।

বর্ষাকাল: মে-অক্টোবর (বর্ষা হাইব্রিড জাত)।

বীজহার: পলি ব্যাগে চারা উৎপাদন করে রোপণ করলে শতক প্রতি ৩.২৫-৪.০ গ্রাম (একরপ্রতি ৩২৫-৪০০ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরী। কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স/প্রোভ্যাক্স/ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

লাউ চাষের জন্য পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করা উত্তম। এতে বীজের খরচ কম লাগে। এজন্য আলো বাতাস স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন জায়গায় ২০-২৫ সেমি উঁচু বেড করে নিতে হবে। বীজ বপনের জন্য ৮ x ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ/পট ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে বীজ গজানোর জন্য মাটির উপযুক্ত আর্দ্রতা ('জো` অবস্থা) নিশ্চিত করে (মাটি জো অবস্থায় না থাকলে পানি দিয়ে জো করে নিতে হবে) তা পলিব্যাগে ভরতে হবে। অত:পর প্রতিব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের ২ গুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে। লাউয়ের বীজের খোসা কিছুটা শক্ত। তাই বীজ বপনের আগে ১৫-২০ ঘন্টা বীজ পানিতে ভিজিয়ে নিলে সহজে বীজের অংকুরোদগম হয়।




চিত্র: পলিব্যাগ বা পটে লাউয়ের চারা

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

ক) বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

খ) রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড বা ঢাকনা দিতে হবে।

গ) চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

ঘ) লাউয়ের চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে রংয়ের পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি- জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ৩ মিটার এবং উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে।

মাদা (গর্ত) প্রস্তুতকরণ- বেডের কিনারা থেকে ৬০ সেমি ভিতরে মাদার কেন্দ্র ধরে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৫০-৫৫ সেমি x ৫০-৫৫ সেমি x ৪৫-৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

লাউ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং অনেক লম্বা সময়ব্যাপী ফলন দেয়। কাজেই ফসলের সফল চাষ করতে হলে গাছের জন্য পর্যাপ্ত খাবার দিতে হয়। লাউ গাছের খাবার সংগ্রহের জন্য শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

লাউয়ের জন্য সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতক)	জমি তৈরির সময় (প্রতি শতক)	প্রতি মাদায় সারের পরিমান (মোট মাদা ১০টি)				
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পরে
গোবর/ কম্পোস্ট	৮০ কেজি	২০ কেজি	৬ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
টিএসপি	৯০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-		-
এমওপি	৮৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	২৫ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-		-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-		-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	৫ গ্রাম	-	-	-	-

১.১.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

৩X ২ মিটার দূরত্বে বীজ বপন করতে হয়। মাদায় সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে, মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়। গভীরতা হবে ২.৫ সেমি (১ ইঞ্চি)। বীজ বপণের ৪-৫ দিনের মধ্যেই গজাবে, ১০-১৫ দিন পর মাদা প্রতি সুস্থ ২টি চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হবে।

পলি ব্যাগে উৎপাদিত চারার বয়স ১৫-১৬ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হয়। মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এককোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা লাগানোর পর

মাদায় পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং মাটির দলা না ভাংগে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের ছত্রাক জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে। এছাড়া পানিতে ভাসমান কচুরীপানার স্তুপে মাটি দিয়ে বীজ বুনেও সেখানে লাউ জন্মানো যায়।

১.১.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: লাউয়ের কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। যখন ১৫-২৫ সেমি লম্বা হবে তখনই মাচা দিতে হবে। এজন্য লাউয়ের জমিতে ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হয়। লাউ মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।



চিত্র: লাউ গাছের মাচা

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় ও পানি লং আগাছা লাউয়ের বিভিন্ন রোগের বিকল্প পোষক (আশ্রয়দাতা)। ভাঁটফুল গাছ রেড পাম্পকিন বিটলের আশ্রয়স্থল। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।



চিত্র: হাতিশুঁড়



চিত্র: পানি লং



চিত্র: ভাঁটফুল

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। লাউয়ের জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র

দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচ দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

মালচিং (আচ্ছাদন): বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে।

শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর শাখা ভাঙ্গার কাজ শুরু করা যায়। এরপর ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার শাখা ছাঁটাই করা যায়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: লাউয়ের পরাগায়ন প্রধাণত: মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টরপ্রতি ২-৩ টি মৌমাছির কলোনী বা বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে। নানা কারণে লাউয়ের সব ফুলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন ঘটে না এবং এতে ফলন কমে যায়। হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করে লাউয়ের ফলন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। লাউয়ের ফুল ঠিকমতো রোদ পেলে দুপুরের থেকে ফোটা শুরু হয়ে রাত ৭-৮টা পর্যন্ত ফোটে। কৃত্রিম পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত করা যায়। তবে পরদিন সকালে পরাগায়ন করলে ফল কম ধরে, কিন্তু ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কয়টা ফুলে ফুলে পরাগায়ন করা হয় তার সব কয়টিতে ফল ধরে। তাই ফুল ফোটার দিন বিকেলে হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করে লাউয়ের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃত্রিম পরাগায়নের নিয়ম হলো ফুল ফোটার পর পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়ি অপসারণ করা হয় এবং ফুলের পরাগধানী (Anther-যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) আস্তে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে (Stigma) ঘষে দেয়া হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৪-৫টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়।



চিত্র: লাউ ফুলে কৃত্রিম পরাগায়ন

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

ক) লাউয়ের মাছি পোকা

এ পোকা লাউয়ের ফলের মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বা বাচ্চা (Larva) বের হয়ে ফলের ভেতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

২০২৫





চিত্র: মাছি পোকা আক্রান্ত লাউ ফুল ও ফল

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ**: মাছি পোকার কীড়া আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। পোকা আক্রান্ত ফল কোনোক্রমেই জমির আশেপাশে ফেলে রাখা উচিত নয়। পোকা আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেললে মাছি পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

২। কচি ফলকে মাছি পোকা থেকে রক্ষা করার জন্য কাগজ বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে ফেলতে হবে ।

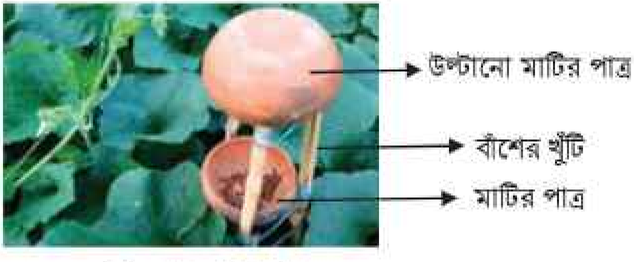
৩। ক্ষেতের মাঝে মাঝে কাঁঠালের মোথা দেয়া, এতে লাউয়ের পরিবর্তে স্ত্রী মাছি কাঁঠালের মোথায় ডিম পাড়বে এবং ক্ষতির পরিমান কমে আসবে।

৪। আম বা খেজুরের রসে সামান্য বিষ মিশিয়ে তা বোতলে রেখে জানালা কেটে দিয়ে ক্ষেতের মাঝে মাঝে স্থাপন করা।

৫। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার: কিউলিওর নামক সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে মাছি পোকার পুরুষ পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে আকৃষ্ট মাছি পোকাগুলোকে মেরে ফেলা যায়। চারা লাগানোর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জমিতে ফাঁদ লাগাতে হবে। প্রতি ২.৫ শতক জমির জন্য ১টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।



চিত্র: সেক্স ফেরোমন ফাঁদ



চিত্র: বিষটোপ ফাঁদ

সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি. দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। বিষটোপ ফাঁদে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট হয় এবং ফাঁদে পড়ে মারা যায়। ১০০ গ্রাম

পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা থেঁতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম সপসিন বা মিপসিন ৭৫ পাউডার অথবা সেভিন ৮৫ পাউডার এবং ১০০ মিলি পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুঁটির সাহায্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মিটার উঁচুতে থাকে। বিষটোপ তৈরির পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরি বিষটোপ ব্যবহার করতে হয়।

৬। সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খ) রেড পাম্পকিন বিটল

রেড পাম্পকিন বিটল পোকা লাল, ছোট, ডিম্বাকার আকৃতির। এর পূর্ণ বয়স্ক পোকা চারাগাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খেতে খেতে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে এবং বয়স্ক গাছের পাতার শিরা উপশিরাগুলো রেখে সম্পূর্ণ সবুজ অংশ খেয়ে পাতা ঝাঝরা করে ফেলে। এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে। এদের কীড়া শিকড় বা মাটির নিচে থাকা কান্ড ছিদ্র করে ফলে গাছ ঢলে পড়ে এবং পরিশেষে শুকিয়ে মারা যায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে।

২। ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩। পাতার নিচের দিকে শুকনা ছাই ছিটাতে হবে।

৪। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

৫। গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে কীড়া (Larva) উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং ডাল পুঁতে পাখি বসার জায়গা করে দেওয়া হয়। একে পার্চিং বলে।

৬। ক্ষেতের আশপাশের বিকল্প পোষক অর্থাৎ কুমড়াজাতীয় সবজি নষ্ট করতে হবে।

৭। আক্রমণের হার বেশি হলে চারা গজানোর পর প্রতি মাদার চারদিকে মাটির সঙ্গে চারাপ্রতি ২-৫ গ্রাম অনুমোদিত দানাদার কীটনাশক (কার্বফুরান গ্রুপের কীটনাশক যেমন-ফুরাডান) মিশিয়ে গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে।

৮। ১ কেজি মেহগনি বীজ কুঁচি করে ৫ লিটার পানিতে ৪-৫ দিন ভিজিয়ে ছেঁকে ২০ গ্রাম সাবানের গুঁড়া ও ৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে ২০ মিনিট ফুটিয়ে শীতল করে ৫ গুণ পানিতে গুলে স্প্রে করতে হবে।

৯। সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট অথবা রিপকর্ড অথবা সিমবুশ ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর

পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বাজারে বিক্রি করা যাবে না।

গ) লাউয়ের জাব পোকা

লাউ এর জাব পোকা খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।চারা, পূর্ণ বয়স্ক, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়ে এ পোকা আক্রমণ করে। পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও আক্রান্ত অংশ পোকাসহ সংগ্রহ করে পুতে ফেলতে হবে।

২। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

৩। বেডে লাইনে দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপন করতে হবে।

২। ফসলের বৃদ্ধির শুরুতে এ রোগের বাহক জাব পোকার আক্রমণ রোধে কেরোসিন মিশ্রিত ছাই পাতায় ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৫। আক্রমণের মাত্রা ও পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে (হলুদ ফাঁদঃ ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয়, পোকা সেখানে উড়ে এসে পড়ে এবং আঠাতে আঁটকে মারা যায়)।

৬। ডিটারজেন্ট ৩ গ্রাম/ লিটার পানি+নিম/ বিষকাঠালী/ ধুতরা/আতা/পেঁপে/ নিশিন্দা/জবা/গাদা ফুলের ১ কেজি পাতা থেতিয়ে ১২ ঘন্টা ভিজে ১০ লিটার পানি স্প্রে করতে হবে অথবা ১০ গ্রাম তামাকের গুড়া, ৫ গ্রাম সাবানের গুড়া ও নিমের পাতার নির্যাস প্রতি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি ট্রিক্স (ডিটারজেন্ট) মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৫ বার স্প্রে করতে হবে। অথবা আধাভাঙ্গা নিম বীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

৭। যদি কোনো গাছে ৫০ টির বেশি পোকা দেখা দেয় তাহলে ইমিডাক্লোপিড ২০ এসএল (ইমিটাফ/ এডমায়ার/ টিডো) ০.৫মিঃলিঃ/ লিটার পানি স্প্রে করতে হবে। অথবা এসিফেট ৭৫ এসপি (এসাটাফ) ১.৫ গ্রাম/লিটার পানি স্প্রে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

রোগবালাই দমন

ক) মোজাইক রোগ



চিত্র: মোজাইক রোগে আক্রান্ত লাউ পাতা

২০২৫

চারা অবস্থায় বীজ গজানোর পর বীজপত্র হলুদ হয়ে যায় এবং পরে চারা নেতিয়ে পড়ে। বয়স্ক গাছের পাতায় হলুদ-সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইকের মতো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো অসম আকারের। দ্রুত বড় হয়। আক্রান্ত পাতা ছোট, বিকৃত ও নিচের দিকে কোকড়ানো, বিবর্ণ হয়ে যায়। শিরা-উপশিরাও হলুদ হয়ে যায়। ফুল কম আসে এবং অধিক আক্রমণে পাতা ও গাছ মরে যায়। আক্রান্ত ফল বেঁকে যায় ও গাছের কচি ডগা জটলার মতো দেখায়। ফলের উপরি অংশ এবড়ো-খেবড়ো দেখা যায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও জমি নিয়মিত পরিদর্শন করে রোগাক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।

২। আগাছা ও বিকল্প আবাদী ফসল পরিষ্কার করতে হবে।

৩। জীবাণুমুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

৪। ফসলের বৃদ্ধির শুরুতে এ রোগের বাহক জাব পোকার আক্রমণ রোধে কেরোসিন মিশ্রিত ছাই পাতায় ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫। আক্রমনের মাত্রা জানতে এবং পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

৬। জমিতে জাব পোকা দেখা গেলে (বাহক পোকা) ডিটারজেন্ট ৩ গ্রাম/ লিটার পানি+নিম/ বিষকাটালী/ ধুতরা/আতা/পেঁপে/ নিশিন্দা /জবা/গাদা ফুলের ১ কেজি পাতা থেতিয়ে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ১০ লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করা। অথবা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি ট্রিক্স মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৫ বার স্প্রে করতে হবে। অথবা

যদি কোনো গাছে ৫০ টির বেশি পোকা দেখা দেয় তাহলে প্রতি লিটার পানিতে এডমায়ার ২০ এসএল ০.৫ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. /২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew) রোগ

বয়স্ক পাতার উপর সাদা পাউডার এর মত দেখা যায়, হাত দিয়ে ধরলে পাউডার এর মত উঠে আসে । এর কারণে গাছ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ফলন হ্রাস পায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১) এই রোগ দমনের জন্য ক্ষেতের আশেপাশের যাবতীয় আগাছা ও বন্য গাছ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।

২) রোগাক্রান্ত গাছের অংশ ভালভাবে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে।

৩) রোগের প্রাথমিক অবস্থায় গাছে গন্ধকচুর্ণ মাসে কমপক্ষে দুইবার করে ছিটালে রোগ প্রশমিত হয়। অথবা

এই রোগটি দূর করতে ২ গ্রাম পরিমাণ থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউপি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভাল করে পাতা ভিজিয়ে দিতে হবে। ঔষধ প্রয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে কোন ফসল সংগ্রহ করা বা খাওয়া যাবে না।

গ) লাউয়ের ব্লোজম এন্ড রট রোগ

আক্রান্ত গাছে প্রথমে কচি লাউয়ের নিচের দিকে পঁচন দেখা দেয়। ধীরে ধীরে পুরো ফলটিই পঁচে যায়। সাধারণত অম্লীয় মাটিতে বা ক্যালসিয়ামের অভাব আছে এমন জমিতে এ রোগ দেখা যায়।

প্রতিকার

১. ক্ষেতে পরিমিত সেচ দিতে হবে ।

২. গর্ত বা মাদা প্রতি ৫০ থেকে ৮০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে ।

৩. একই জমিতে বার বার একই সবজি আবাদ না করা।

৪. জমিতে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন (পাথুরে চুন) প্রয়োগ করলে পরপর আর তিন বছর প্রয়োগ করতে হবেনা।

৫. মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

১.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: ফলের পরিপক্কতা বোঝার উপায় হচ্ছে ফলের গায়ে প্রচুর ছোট ছোট শুং এর উপস্থিতি থাকবে এবং ফলের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নখ ঢুকে যাবে। চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু হয়। পরাগায়নের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল যত বেশি সংগ্রহ করা হবে ফলনও তত বেশি হবে। লাউয়ে খোসায় যে পর্যন্ত সহজেই চিমটি কাটা যায় ততদিন পর্যন্ত লাউ সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পরবর্তী সময় থেকে লাউ পাকা অবস্থা পর্যন্ত সাধারণত: আর সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয় না।

ফসল সংগ্রহ: ফলের লম্বা বোঁটা রেখে ধারালো ছুরি দ্বারা ফল কাটতে হবে।

ফলন: প্রতি মাদায় ফলন ১৫০-২০০ কেজি/শতক (প্রতি একরে ১২-১৮ টন)।

সংরক্ষণ: লাউ কাটার পর ছায়ায় ও ঠান্ডায় ২/৩ দিন পর্যন্ত হালকা পানির ছিটা দিয়ে রাখা যায়। কার্টুন প্যাকেটে খাড়াভাবে সাজিয়ে বাজারজাত করা হলে লাউয়ের গুণাগুণ ও ভৌত অবস্থা ভাল থাকে।

১.২ মিষ্টিকুমড়া (Sweet gourd)

মিষ্টিকুমড়া একটি উপাদেয় সবজি।এদেশে প্রায় সব জেলাতেই মিষ্টিকুমড়ার আবাদ হয়। আগে মিষ্টিকুমড়া গ্রীষ্মকালের একটি প্রধান সবজি ছিল। এখন দেশে বেশ কিছু হাইব্রিড জাতের মিষ্টিকুমড়া সারাবছরই চাষ হচ্ছে। লাউয়ের মতো একই মিষ্টিকুমড়া গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় ।

১.২.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

মিষ্টিকুমড়ার পরিচিতি ও ব্যবহার: মিষ্টিকুমড়া ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ সবজি। এর ফল কাঁচা ও পাকা উভয়ই অবস্থায়ই সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। কুমড়ার পাতা, কচি ডগা ও ফুল খাওয়া যায়। পাকা মিষ্টিকুমড়ার শাঁস দিয়ে সস্, হালুয়া, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি করা যায়। পাকা ফল চোখের রাতকানা রোগ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

বৈজ্ঞানিক নাম: এর বৈজ্ঞানিক নাম *Cucurbita moschata*

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ১.৪ গ্রাম প্রোটিন, ১০০ মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ৩০ মিগ্রা ফসফরাস, ৫০ মাইক্রোগ্রাম বিটা ক্যারোটিন, ২ গ্রাম ভিটামিন সি থাকে।

উৎপত্তি: মধ্য আমেরিকা অঞ্চল ।

জলবায়ু ও মাটি: মিষ্টিকুমড়া চাষের জন্য ১৬০-১৭০ দিনের মত উষ্ণ, প্রচুর সূর্যালোক, নিম্ন আর্দ্রতা উত্তম। তবে সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা ২০-২৫° সে.। উচ্চ তাপমাত্রা ও লম্বা দিনে পুরুষ ফুলের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যায়। বন্যামুক্ত এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি কুমড়া চাষের জন্য উপযোগী। মাটির অম্লমান ৫.৫ উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিপ উভয়ই মৌসুম।

জাত পরিচিতি

বারি মিষ্টিকুমড়া-১, বারি মিষ্টিকুমড়া-২, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-১, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-২, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-৩, থান্ডার বল, সুপ্রিমা, সুইটি ইত্যাদি।

বপন সময়

শীতকালীন: অক্টোবর- ডিসেম্বর।

গ্রীষ্মকালীন: ফেব্রুয়ারি-মে।

বীজহার

পলিব্যাগের চারা রোপণের ক্ষেত্রে: শতকপ্রতি ৪-৬ গ্রাম (হেক্টরপ্রতি ৪০০-৬০০ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন।

মাদায় বীজ বপনের ক্ষেত্রে: শতকপ্রতি ২০-২৫ গ্রাম (হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫ কেজি)।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: নার্সারিতে চারা পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভাল হয়। বীজ বপনের জন্য ৮X ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগ ভরতে হবে। সহজ অংকুরোদগমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা অথবা শতকরা ১ ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে বীজ এক রাত্রি ভিজিয়ে অত:পর পলিব্যাগে বপন করতে হবে। প্রতি ব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

১. শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

২. চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার গায়ে পানি না পড়ে।

৩. পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

৪. চারা গাছে রেড পামকিন বিটল পোকার আক্রমণ হলে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

১.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ: সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে জমি প্রস্তুত করতে হবে যেন জমিতে ঢেলা ও আগাছা না থাকে।

বেড ও মাদা তৈরি : এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ জাতভেদে ৩ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে নিতে হবে। বেডের উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ এবং নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে। ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার দূরে দূরে এক সারিতে ৫০-৫৫ সেমি X ৫০-৫৫ সেমি X ৪৫-৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে। সারির অপর পার্শে ২ মিটার খালি জায়গায় লতা বাইবার সুযোগ পাবে। মাদা থেকে মাদার দুরত্ব ২.৫ মিটার (রবি মৌসুম) এবং ৩.০ মিটার (খরিপ মৌসুমে)। প্রতি মাদায় বীজের সংখ্যা ২-৩টি (চারা হলে ১টি রাখতে হবে)।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মিষ্টিকুমড়া দীর্ঘদিন ধরে বেঁচে থাকে এবং প্রচুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন। তাই সার প্রয়োগ হতে হবে পর্যাপ্ত।

নিম্নোক্ত হারে সারের পরিমান ও মাত্রা সুপারিশ করা যেতে পারে:

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতাংশ)	জমি তৈরির সময় (প্রতি	প্রতি মাদায় (মোট মাদা ৭টি)				
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন	চারা রোপণের ১০-১৫	চারা রোপণের ৩০-৩৫	চারা রোপণের ৫০-৫৫	চারা রোপণের ৭০-৭৫

		শতাংশ)	পূর্বে	দিন পর	দিন পর	দিন পর	দিন পর
পচা গোবর	৪৫ কেজি	১০ কেজি	৫ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	৭৭০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	৮৪০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
এমওপি	৬৫০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	২৫ গ্রাম			
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	২৮০ গ্রাম	-	৪০ গ্রাম	-	-	-	-

১.২.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

২.৫ মিটার x ২.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন করতে হয়। মাদায় সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে, সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করতে হয়। পলি ব্যাগে উৎপাদিত চারার বয়স ১৫-১৬ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়।

চারা রোপণের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হয়। মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এককোপ দিয়ে চারা লাগানোর জায়গা করে নিতে হবে। অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা লাগানোর পর মাদায় পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং মাটির দলা না ভাংগে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে। এছাড়া পানিতে ভাসমান কচুরীপানার স্তুপে মাটি দিয়ে বীজ বুনেও সেখানে মিষ্টিকুমড়া জন্মানো যায়।

১.২.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: মিষ্টি কুমড়ার কাংখিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। যখন ১৫-২৫ সেমি লম্বা হবে তখনই মাচা দিতে হবে। এজন্য মিষ্টি কুমড়ার জমিতে ১.৭ মিটার উঁচু করে মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হয়। মিষ্টি কুমড়া মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।

আগাছা দমন: মিষ্টিকুমড়ার জমিতে দন্ড কলস, চাপড়া, মুথা, বনমরিচ, দূর্বা, প্রেমকাঁটা, শনঘাস ইত্যাদি আগাছা জন্মে। এসব আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় এবং বিভিন্ন পোকার আশ্রয়স্থল ও রোগের বিকল্প পোষক। তাই চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদাপ্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ দেওয়া: মিষ্টি কুমড়া ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে । প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে ৫-৭ দিন পর পর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

মালচিং: প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

শোষক শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো সিকেচার/ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়ন: মিষ্টি কুমড়ার পরাগায়ন প্রধাণত: মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। মিষ্টি কুমড়ার একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ধরে। পুরুষ ফুলে শুধুমাত্র বোঁটার উপরে ফুলের পরাগদন্ড (Style) ও তাতে পরাগরেণু (Pollen) থাকে। স্ত্রী ফুলের পাপড়ির নিচে সবসময় ছোট আকারের একটি ফল থাকে। সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত অথবা সকালে যতক্ষণ পযন্ত রোদের তাপ কম থাকে পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়িগুলো অপসারণ করে এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের কাছাকাছি নিয়ে সংস্পর্শ ছাড়াই পুরুষ ফুলে আস্তে করে টোকা দিতে হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৪-৫টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়।



চিত্র: মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ন

পোকামাকড় দমন

ক) মাছি পোকা

মাছি পোকা সাধারণত: কুমড়া জাতীয় ফসলের কচি ফলে বেশী আক্রমণ করে। স্ত্রী মাছি তার লম্বা সরু ডিম পাড়ার নলের সাহায্যে কচি ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেয়ে বড় হতে থাকে, ফলে আক্রান্ত ফল পঁচে যায় ও খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকা আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়ে যায় ঠিকমত বাড়তে পারেনা, ফলে বাজার দর একদম কমে যায়। এদের আক্রমনের ফলে প্রায় ৫০ -৭০ ভাগ ফল নস্ট হয়ে যায়।

১.২.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: মিষ্টি কুমড়ার কাঁচা ফল পরাগায়ণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। তখনও ফলে সবুজ রঙ থাকবে এবং ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। নখ দিয়ে ফলের গায়ে চাপ দিলে নখ সহজেই ভিতরে ঢুকে যাবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করে মিষ্টিকুমড়ার পূর্ণ পরিপক্কতা নির্ধারণ করা হয়ঃ

ক) ফলের রঙ হলুদ অথবা হলুদ-কমলা অথবা খড়ের রং ধারণ করবে।

খ) ফলের বোঁটা খড়ের রঙ ধারণ করবে। গাছের ডগা শুকাতে শুরু করবে।

ফসল সংগ্রহ: কাঁচা ফল পরাগায়নের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। এ সময় ফলের রং সবুজ থাকে। ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়। নখ দিয়ে চাপ দিলে সহজেই ডেবে যাবে। ফল যখন হলুদ, হলুদ-কমলা বা খড়ের রং ধারণ করবে এবং ফলের ডগা শুকাতে শুরু করবে তখনই পাকা ফল সংগ্রহ করতে হবে। পাকা ফল সংগ্রহকালে বিশেষ সতর্কতা পাকা ফল সংগ্রহের দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে সেচ দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এতে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি হবে। একরপ্রতি ফলন ১২-২০ টন (১২০- ১৮০ কেজি/শতাংশ)।

ফসল সংরক্ষণ: ফলের ত্বক মোটামুটি শক্ত বিধায় অন্যান্য সবজির তুলনায় এর পচনশীলতা কম। পরিবারের অসময়ের সবজি এবং বাজার মূল্যের কথা বিবেচনায় পাকা ফল দীর্ঘদিন (১ থেকে ৬ মাস) সংরক্ষণ করা যায়। মাচা অথবা মেঝেতে পাটাতন তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়। আড়তদাররা গোলা করে সংরক্ষণ করে থাকেন।

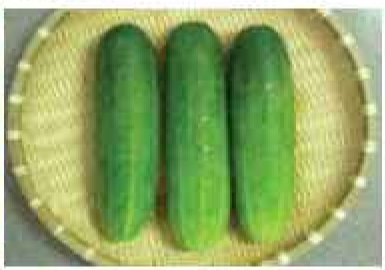
১.৩ শসা (Cucumber)

শসা পৃথিবীর সকল দেশে জন্মানো হয়। এমনকি শীতপ্রধান দেশে কাঁচ-ঘরের নিয়ন্ত্রিত তাপ ও আর্দ্রতায়ও শসা ফলানো হয়ে থাকে। চীনে বিশ্বের প্রায় ৬০% শসা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে আগে শসা শুধু গ্রীষ্মকালেই হতো। বর্তমানে হাইব্রিড জাতের কল্যানে সারাবছরই শসা চাষ হয়ে থাকে। সবজির ফুল সহবাসী (Monoecious) অর্থাৎ একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয় । তাই ফল ধরার জন্য পরপরাগায়ন অত্যাবশ্যক।

শসা ও খিরা খেতে প্রায় একই রকম হলেও দুটি একটু আলাদা। শসা বড় ও লম্বা, শাঁস পুরু ও অপেক্ষাকৃত শক্ত, বিচি বড়। খিরা ছোট, শাঁস শসার চেয়ে নরম ও বিচি ছোট।



চিত্র: খিরা



চিত্র: শসা

২০২৫

১.৩.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

শসার পরিচিতি ও ব্যবহার: শসা এক প্রকারের ফল। লতানো উদ্ভিদে জন্মানো ফলটি লম্বাটে আকৃতির এবং প্রায় ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। এর বাইরের রঙ সবুজ। তবে পাকলে হলুদ হয়ে থাকে। ভেতরে সাদাটে সবুজ রঙের হয় এবং মধ্যভাগে বিচি থাকে। সরাসরি খাওয়া, সালাদ ও তরকারির জন্য শসা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। উন্নত দেশে এটি প্রচুর পরিমানে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। পাকা শসার পায়েস ও মোরব্বা সুস্বাদু।

বৈজ্ঞানিক নাম: এর বৈজ্ঞানিক নাম *Cucumis sativus.*

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য শসায় ৯৬ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৬ গ্রাম আমিষ, ২.৬ গ্রাম শ্বেতসার, ১৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.২ মিলিগ্রাম লৌহ, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন, ১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি রয়েছে।

উৎপত্তি: শসার উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে নেপাল মতান্তরে ভারত।

জলবায়ু ও মাটি: ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রায় শসা সবচেয়ে ভাল জন্মে। শসার অধিক ফুল উৎপাদনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রা, দীর্ঘদিবস এবং প্রখর আলো প্রয়োজন। উর্বর দো-আঁশ মাটি শসা উৎপাদনের জন্য ভাল। মাটির অম্লমান (PH) ৫.৫-৬.৮ শসা চাষের জন্য উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: সারাবছর

জাত পরিচিতি

স্থানীয় জাত: বারোমাসি ও পটিয়া জায়েন্ট (খিরার জাত-লাকি-৭, বাঁশখালী, মধুমতি, নওগাঁ গ্রীন ইত্যাদি)।

উফশীজাত: শীলা, গ্রীনকিং, গ্রীনজায়েন্ট।

হাইব্রিড: হীরা-৯০৪, আলভী গ্রীন, এভারগ্রীন, তিতুমির, বুলবুল

বপন সময়: ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত শসার বীজ বুনার উপযুক্ত সময়।

বীজহার: সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে- ৩-৪কেজি/হেক্টর (১২-১৬ গ্রাম/শতক)।
পলিব্যাগের চারা রোপণের ক্ষেত্রে- ২.৫-৩.৫কেজি/হেক্টর (১০-১৪ গ্রাম/শতক)।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

শসা চাষের জন্য পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করার জন্য ৮ X ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ নিতে হবে। অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে জো অবস্থায় সেই মাটি পলিব্যাগে ভরতে হবে। পলিব্যাগে মাটি সম্পূর্ণ না ভরে পলিব্যাগের উপর থেকে ১-২ সেন্টিমিটার খালি রেখে দিতে হবে।। তারপর পলিব্যাগগুলোকে একটা বেডে সুন্দর করে সাজিয়ে একটি ব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

- রোদ ও বৃষ্টির হতে থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড বা ছাউনি দিতে হবে।

২০২৫

- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- শসার চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে চারা উঠানোর আগ পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.৩.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ- জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.৫ মিটার এবং উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ এবং নিকাশ নালা থাকতে হবে এবং প্রতি দুই বেড অন্তর ৩০ সেমি প্রশস্ত ১টি করে নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ- বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি ভিতরে মাদার কেন্দ্র ধরে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৪৫X৪৫X৪০সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার প্রয়োগ/শতক

সারেরনাম	মোট পরিমান	শেষ চাষের সময়	চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে গর্তে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	ফুল আসার সময়	ফল ধরার সময় (২ বার ১৫ দিন অন্তর)
গোবর/ কম্পোস্ট	৬০কেজি	৩০কেজি	৩০কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	৭০০গ্রাম	-	২০০গ্রাম	২০০গ্রাম	১০০গ্রাম	১০০গ্রাম + ১০০গ্রাম
টিএসপি	৬০০গ্রাম	৩০০গ্রাম	৩০০গ্রাম	-	-	-
এমওপি	৭৫০গ্রাম	২০০গ্রাম	৩৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম + ৫০গ্রাম
জিপসাম	৪০০গ্রাম	৪০০গ্রাম	-	-	-	-
জিংকসালফেট	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০গ্রাম	৪০গ্রাম	-	-	-	-

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৫০ গ্রাম	-	৫০ গ্রাম	-	-	-	-

১.৩.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

বপন/রোপণের সময় ও পদ্ধতি

বছরের যে কোন সময় শসার বীজ বপন করা যায়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত শসার বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়। বীজ বোনার পুর্বে বীজ কয়েক ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অংকুরোদগম দ্রুত হয়। শসার বীজ সরাসরি অথবা চারা তৈরি করে মাদায় রোপণ করা যায়।

পলিব্যাগে চারা তৈরি করে জমিতে লাগানো উত্তম। ৫০:৫০ অনুপাতে পচা গোবর বা কম্পোস্ট ও মাটি একত্রে মিশিয়ে ৮ X ১০ সেমি সাইজের পলিথিনের ব্যাগে ভরতে হবে। প্রতিব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করতে হবে। চারার বয়স ১৬-২০ দিন হলে মাদায় স্থানান্তর করতে হবে। প্রতিব্যাগে ২টি চারা থাকলে মাঠে রোপণের ৬-৭ দিন পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল চারাটি তুলে প্রতিমাদায় ১টি করে চারা রাখতে হবে। রোপণের সময় ১.৫ মিটার X ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

১.৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ: বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে। চারা মাটিতে প্রতিস্থিত হওয়ার পর এর চারিদিকের মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

মাচা তৈরি বা জাংলা দেওয়া: গাছ ২০-২৫ সেমি লম্বা হলে খুঁটি ও জিআই তারের নেট বা নাইলনের রশি দিয়ে মাচা তৈরি করে দিতে হবে। পাট কাঠি বা ধৈঞ্চা গাছের শলাও এ কাজে ব্যবহার করা যায়। মাচা মাটি থেকে ১.৫ মিটার উঁচু হবে। দুই বেডের মাঝে একটি মাচা দিলেই চলবে।

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় ও ঝিলমরিচ আগাছা শসার বিভিন্ন রোগের বিকল্প পোষক (আশ্রয়দাতা)। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে বিশেষ করে মাদায় কোন আগাছা রাখা যাবে না।।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদাপ্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা: শসা পানির প্রতি খুব সংবেদনশীল। মাটি শুকিয়ে গেলে গাছ ঢলে আসে ও ফুল ঝরে যায়। তাই খরা দেখলে দ্রুত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার বর্ষাকালে ক্ষেতে পানি জমে থাকাও শসার জন্য ক্ষতিকর। কয়েকদিন পানি জমে থাকলে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে। সেজন্য নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচিং বা আচ্ছাদন: বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে।

ছাঁটাইকরণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো সিকেচার/ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়ন: ফল ধারণ বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সকাল ৯.০০ টার মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হবে। এজন্য হাত দিয়ে পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে নিয়ে হালকা করে ঘষা দিতে হবে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

ক) শসার রেড পাম্পকিন বিটল পোকা

পামকিন বিটলের পূর্ণবয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে। এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

খ) শসার মাছি পোকা দমন

এ পোকা কচি ফলের খোসার ভিতর ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা বা কীড়া ফল খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।





চিত্র: শসার মাছি পোকা

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউ, মিষ্টিকুমড়ার অনুরুপ।

সাবধানতা: স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

করনীয়: উত্তমরুপে জমি চাষ দিয়ে পোকার পুত্তলি পাখিদের খাবার সুযোগ করে দিতে হবে।

গ) শসার সাদা মাছি পোকা:

খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট। গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পরতে পারে। এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই কম হয়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১। আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে ।

২। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

৩। সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০ গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫ গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

৪। Azadirectin গ্রুপের বায়োনিম প্লাস ১মিলি/লিটার হিসেবে ৭ দিন পর পর স্প্রে করা যেতে পারে।

৫। আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঘ) শসার জাব পোকা:

পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চা (নিম্ফ) উভয় পাতা, কচি কান্ড ও ফুলের রস চুষে খায়।গাছ দুর্বল ও হলুদ হয়, পাতা কুঁকড়ে যায়, ফুলের কুড়ি ও কচি ফল ঝরে যায়।পোকা মধু রস নিঃসরণ করে, তাতে সুটিমোল্ড ছত্রাক জন্মে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

রোগ দমন

ক) শসার মোজাইক ভাইরাস রোগ:

হলুদ বা হালকা সবুজ এবং ছোপছোপ হলুদ দাগ পাতা ও ফলে দেখা যায়। কম বয়সী পাতা সরু হয়ে কুঁচকে যায় এবং সমগ্র ফসলের বৃদ্ধি মারাত্নকভাবে ব্যহত হয় ও ফলন কমে যায়।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

খ) পাউডারি মিলিডিউ রোগ:

এই রোগে পাতার উপর সাদা পাউডার এর মত দেখা যায়, হাত দিয়ে ধরলে পাউডার এর মত উঠে আসে। এর কারণে গাছ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ফলন হ্রাস পায়।

দমন ব্যবস্থাপনা:

এই রোগটি দূর করতে ২ গ্রাম পরিমাণ থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউপি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভাল করে পাতা ভিজিয়ে দিতে হবে। বড় ক্ষেতে প্রতি বিঘার জন্য ১২০ গ্রাম ঔষধ দরকার৷ হবে। ঔষধ প্রয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে কোন ফসল সংগ্রহ করা বা খাওয়া যাবে না।

গ) অ্যানথ্রাকনোজ রোগ

এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে পাতায় হলদে দাগ হয়, পরে দাগগুলো বাদামি বা কালো হয়ে ঐ অংশ পচে যায়। ফলের বাইরের আবরনে এই বাদামি দাগ দেখা যায় ও ফল পচে যায়।



চিত্র: শসার অ্যানথ্রাকনোজ রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা

১। এর প্রতিকারের জন্য বীজ লাগানোর পূর্বে বীজ শোধণ করতে হবে। ১ কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ নামক ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে মিশিয়ে নিতে হবে।

২। রোগের মাত্রা বেশি হলে ডায়থেন ৪৫ গ্রাম ১০ লিটার পরিমাণ পানির সংগে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ক্ষেতে রাসায়নিক ঔষধ দেবার অন্তত ৭ দিন পর্যন্ত ঐ ক্ষেতের ফসল বিক্রি অথবা খাওয়া যাবে না।

অথবা, এই রোগ দমনের জন্য ঘরে তৈরি বোর্দ মিশ্রণ (ছত্রাকনাশক) আক্রান্ত গাছে ছিটানো যেতে পারে। এক শতাংশ জমির জন্য এই বোর্দ মিশ্রণ তৈরির করতে ১৭.৫ লিটার পানির সাথে ৩৫০ গ্রাম পাথুরে চুন ও অন্য ১৭.৫ লিটার পানির সাথে ৩৫০ গ্রাম তুঁতে আলাদা আলাদা ভাবে মাটির পাত্রে মিশাতে হবে। পরবর্তীকালে এই দুই মিশ্রণ পুনরায় অপর এক মাটির পাত্রে ভালোভাবে মিশাতে হবে এবং আক্রান্ত গাছে ছিটাতে হবে। ১৫ দিন পর পর এভাবে নতুন মিশ্রণ তৈরি করে ছিটাতে হবে।

৩) ফসল তোলার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়ে ফেলতে হবে।

১.৩.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

জাতভেদে বীজ বপনের ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিদিনই বা ২/১ দিন পর পর শসা সংগ্রহ করা যায়। কচি অবস্থায় শসা সংগ্রহ করলে গাছে অধিক সংখ্যক ফলে। সালাদ, আচার ইত্যাদির জন্য কচি অবস্থায় তোলা উচিত। শসার তরকারী করতে হলে সেগুলো কিছু বয়স্ক করে তোলা উচিত। উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করলে হেক্টরপ্রতি ১০-২০ টন শসা সংগ্রহ করা যায়।

শসা পচনশীল বলে দ্রুত বাজারজাত করতে হয়। গাছে ভালোভাবে পাকানো শসা প্রায় সপ্তাহখানেক সংরক্ষণ করা যায়।

১.৪ করলা (Bitter gourd)

করলা একবর্ষজীবি উদ্ভিদ। এটি তিতা হলেও খাদ্যমান ও ঔষধি গুণাবলীর ধরুন অনেকের কাছে বেশ উপাদেয় একটি সবজি। এটি বহুমূত্র (Diabetes), বাত, হাঁপানি ও চর্মরোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নরসিংদী জেলায় প্রচুর করলার চাষ হয়। একই করলা গাছে আলাদাভাবে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ফোটে। ফুলের রং হলুদ। বাংলাদেশে দুই ধরণের করলার চাষ হয়ে থাকে। আকারে বড় ও লম্বা হলে তাকে করলা বলা হয় এবং আকারে ছোট, প্রায় গোলাকার বা কিছুটা লম্বা (ডিম্বাকৃতির) হলে তাকে উচ্ছে বলা হয়।

১.৪.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: করলা তিতা হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি। করলা এদেশে গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে চাষ হয়। করলা সাধারণত কাঁচা ও কচি অবস্থায় সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। এর কচি

ডগা পার্বত্য চট্টগ্রামে শাক হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। কচি পাতা ও কাঁচা করলার রস বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে খাওয়া হয়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পেঁয়াজ ও আলু-করলার ভাজি একটি জনপ্রিয় খাবার। করলায় কিউকারবিটাসিন নামক রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির কারণে স্বাদ তিতা হয়। জাপান ও চীনে অনেকে করলাকে দীর্ঘ জীবন লাভের গোপন রহস্য বলে মনে করে।

বৈজ্ঞানিক নাম: বৈজ্ঞানিক নাম *Momordica charantia*

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম করলায় ৮৩.২ গ্রাম জলীয় অংশ, ১.৪ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১.৭ গ্রাম আঁশ, ৬০ কিলোক্যালরি খাদ্য শক্তি, ২.১ গ্রাম আমিষ, ১.০ গ্রাম চর্বি, ১০.৬ গ্রাম শর্করা, ২৩ মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ২.০ মিগ্রা লৌহ, ১২৬ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন এবং ৯৬ মিগ্রা ভিটামিন-সি রয়েছে।

উৎপত্তি: উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশ।

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় করলা ভাল হয়। শুষ্ক আবহাওয়াতে এটি জন্মানো যায়। করলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। আবার অতিবৃষ্টি পরাগায়নে বাধা সৃষ্টি করে। বীজ অংকুরোদগমের জন্য ৩০-৩৫° সে. তাপমাত্রা উত্তম। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটিতে করলা ভাল হয়। সারাদিন রোদ পড়ে এমন উঁচু জায়গায় করলা চাষ উত্তম। এটি সামান্য ক্ষারযুক্ত মাটিতে এবং কিছুটা অম্লীয় মাটিতেও চাষ হয়। করলা চাষের জন্য মাটির উপযোগী p^H ৫.৫-৬.৭।

উৎপাদন মৌসুম: খরিপ মৌসুম।

জাত পরিচিতি: বারি করলা-১, বারি করলা-২, বারি করলা-৩, বারি করলা-৪, গজ করলা, বারি হাইব্রিড করলা-২, বারি হাইব্রিড করলা-৩, টিয়া

বীজ বপনের সময়: ফেব্রুয়ারি-মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র)

বীজহার: প্রতি শতক বীজতলায় করলার বীজের পরিমান ২৪ - ২৮ গ্রাম(হেক্টরপ্রতি ২৪০০-২৮০০ গ্রাম)। করলা ও উচ্ছের জন্য হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৬ থেকে ৭.৫ ও ৩ থেকে ৩.৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরী। কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স/ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

বীজ বপনের জন্য ৮ x ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ/পটে ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে বীজ গজানোর জন্য মাটির উপযুক্ত আর্দ্রতা (`জো` অবস্থা) নিশ্চিত করে (মাটি জো অবস্থায় না থাকলে পানি দিয়ে জো করে নিতে হবে) তা পলিব্যাগে ভরতে হবে। অত:পর প্রতিব্যাগে ১টি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের ২ গুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে। করলার বীজের খোসা কিছুটা শক্ত। তাই বীজ বপনের আগে ১৫-২০ ঘন্টা বীজ পানিতে ভিজিয়ে নিলে সহজে বীজের অংকুরোদগম হয়।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

ক) রোদ ও বৃষ্টির হতে থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড দিতে হবে।

গ) চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

ঘ) করলার চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.৪.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিস্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি- সেচ ও নিস্কাশন সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.০ মিটার এবং উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে।

মাদা (গর্ত) প্রস্তুতকরণ- করলার ক্ষেত্রে সারিতে ১.৫ মিটার এবং উচ্ছের ক্ষেত্রে ১.০ মিটার দূরে দূরে ৪০ সেমি X ৪০ সেমি X ৪০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

করলার সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতক)	জমি তৈরির সময় (প্রতি শতক)	প্রতি মাদায় সারের পরিমান (মোট মাদা ২০টি)				
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পরে
গোবর/ কম্পোস্ট	৮০ কেজি	৪০ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	১০০০ গ্রাম	-	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	১৮ গ্রাম	-	-		-
এমওপি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-		-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-		-

ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	২.৫ গ্রাম	-	-	-	-	-

১.৪.৩ বীজ বপন/চারা রোপণ: করলার বীজের ত্বক পুরু ও শক্ত বিধায় ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়। উচ্ছে ও করলার বীজ সরাসরি মাদায় (৪০X৪০X৪০ সেমি) বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন অথবা পলিব্যাগে উৎপাদিত ১৫-২০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত: ৭-১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরী করে নিতে হবে। ৭-১২ দিনের মধ্যে বীজ গজায়।

১.৪.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: করলার কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। এতে করলার গুণগত মানও ভাল হয়। চারা ২০-২৫ সেমি লম্বা হলে করলার জমিতে ১- ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচা বা বাউনি তৈরি করতে হয়। উচ্ছে গাছের জন্য মাচা তৈরি না করে মাটিতে খড় বিছিয়ে তার উপর গাছ লতিয়ে দেয়া যায়।

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় আগাছা দমন করতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা গজানো বা রোপণের পর থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: পানির অভাবে করলা গাছে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- চারার বৃদ্ধি কমে যাওয়া, গাছ নেতিয়ে আসা, ফুল কম ফোটা ও ঝরে যাওয়া, ফল ঝরে যাওয়া, কচি ফল বড় না হওয়া ইত্যাদি। সেচ দিলে এসব সমস্যা কেটে যায়। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

মালচিং (আচ্ছাদন): বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে। বর্তমানে প্লাস্টিক মালচ ব্যবহার করা হচ্ছে।

শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে দিলে শারীরিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং আন্তঃকর্ষণের কাজে সহায়তা করে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর শাখা ভাঙ্গার কাজ শুরু করা যায়। এরপর ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার শাখা ছাঁটাই করা যায়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: অধিক ফলনের জন্য সকাল ৯.০০ টা হতে দুপুর ২.০০ টার মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

করলার মাছি পোকা

এ পোকা করলার ফলের মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বা বাচ্চা (Larva) বের হয়ে ফলের ভেতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

রোগবালাই দমন

ক) লিফ কার্ল রোগ

এটি একটি ভাইরাস জনিত রোগ। সাদা মাছি দ্বারা ভাইরাস ছড়ায় । আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতি হয় । পাতার গায়ে ঢেউয়ের মত ভাজের সৃষ্টি হয়, কুঁচকে যায় । বয়স্ক পাতা পুরু ও মচমচে হয়ে যায় । অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা বের হয় ও ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা

১. আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা। ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।
২. রোগাক্রান্ত গাছ থেকে কোনো বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার না করে রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে ।
৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করতে হবে ।
৪. সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।
৫. আক্রমনের মাত্রা জানতে হবে এবং পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
৬. জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি ট্রিক্স মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৫ বার স্প্রে করতে হবে। অথবা ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন ডায়ামেথয়েট, এসাটাফ, এডমায়ার, টিডো এর যে কোন একটির ১০ মিলি /২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ) মোজাইক রোগ:

এটি ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

দমন

- ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

১০১৫

- জাব পোকা ও সাদা মাছি এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক যেমন: এডমায়ার ১ মি.লি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে।
- সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

১.৪.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

করলা সংগ্রহের সময় নির্ধারণ: করলা তোলার সঠিক সময় হল ফলের চামড়া হলুদ হওয়ার ঠিক পূর্বে সংগ্রহ করতে হয় এবং জাতভেদে প্রায় ৮ থেকে ১৫ সেমি (৩ থেকে ৬ ইঞ্চি) আকারের হয়। চারা গজানোর ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু হয়। চারা গজানোর ৪৫-৪৫ দিন পর উচ্ছের গাছ ফল দিতে থাকে। করলার বেলায় প্রায় ২ মাস লেগে যায়। স্ত্রী ফুলের পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুমাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ফসল সংগ্রহ: সাধারণত হাত দিয়ে ধারালো চাকু দিয়ে করলা সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন: উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে উচ্ছে ও করলার হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ৭-১০ টন (৩০-৪০ কেজি/শতাংশ) এবং ২০-২৫ টন (৮০-১০০ কেজি/শতাংশ) পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ: স্বল্প পরিসরে সাধারণত ৩-৪ দিন সংরক্ষণ করা যায়। প্যাকেজিং এর জন্য র‍্যাপিং পেপার, পারফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প্লাস্টিক কেস ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১.৫ চিচিঙ্গা (Snake gourd)

চিচিঙ্গা গাছ একবর্ষজীবী লতানো গুল্ম প্রকৃতির উদ্ভিদ। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে চিচিঙ্গার চাষ হয়। এটি বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই চাষ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বনে ও জুমে বুনো প্রকৃতির চিচিঙ্গা দেখা যায়। চাষকৃত চিচিঙ্গার ফল লম্বা, কিন্তু বুনো চিচিঙ্গার ফল খাটো।

১.৫.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: চিচিঙ্গা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের একটি অন্যতম প্রধান সবজি। এর অনেক ঔষধী গুণ আছে। চিচিঙ্গা বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে রেখা, কুশি, কইডা, কইধা, কইড্যা ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই লম্বা, সর্প-সদৃশ সবজিটি আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয় এবং বাজারেও অধিক পরিমানে পাওয়া যায়।

এ সবজিটি বেশ পুষ্টিকর। প্রধানত: সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। চিংড়ি চিচিঙ্গা চচ্চড়ি বা ভাজি একটি উপাদেয় খাবার। চিচিঙ্গা দিয়ে স্যুপ তৈরি করা হয়। চিচিঙ্গা পাতার রস মাথার খুশকি দূর করতে ব্যবহার করা হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: বৈজ্ঞানিক নাম *Trichosanthes cucumerina*

২০২৫

পুষ্টিমান: চিচিঙ্গার প্রায় ৯৫ শতাংশই পানি। বাকী ৫ শতাংশের মধ্যে ৩.২-৩.৭ শতাংশ আছে শর্করা ও ০.৪-০.৭ শতাংশ আছে আমিষ। প্রতি ১০০ গ্রাম চিচিঙ্গায় আছে ৩৫-৪০ মিগ্রা ক্যালসিয়াম ও ০.৫-০.৭ মিগ্রা লৌহ। চিচিঙ্গার কিছু ভেষজ গুণ আছে।

উৎপত্তি: দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চিচিঙ্গার উৎপত্তি।

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় চিচিঙ্গা ভালো জন্মে। বীজের অংকুরোদগম ও গাছের ভালো বৃদ্ধির জন্য উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন। যেমন, দিনের বেলায় ২৫-২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং রাতের বেলায় ১৮-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়াতেও ভালো জন্মে।

চিচিঙ্গা চাষের জন্য যেমন অধিক পানির প্রয়োজন হয়, অন্য দিকে এটি আবার জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে এর পরাগায়ন বিঘ্নিত হতে পারে। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি চিচিঙ্গা চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। চিচিঙ্গা চাষের জন্য মাটির উপযোগী p^H ৬.৫-৭.৫।

উৎপাদন মৌসুম: খরিপ মৌসুম।

জাত পরিচিতি

১। **বারি চিচিঙ্গা-১:** এটি উচ্চফলনশীল জাত এবং সারাদেশে চাষ উপযোগী। জাতটিতে গাছ প্রতি গাঢ় সবুজ রংয়ের ৪০-৪৫ টি ফল ধরে। প্রতি ফলের গড় ওজন ১০০-১৩০ গ্রাম যা লম্বায় ২৭-৩০ সেমি এবং ব্যাস ৫-৬ সেমি।হেক্টর প্রতি ফলন ২৫-৩০ টন পাওয়া যায়।বীজ বপনের ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ১ম ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল সাধারণত ১৬০-১৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

২। **বিইউ (BU) চিচিঙ্গা-১**

৩। **ঝুম লং:** বিএডিসি এ জাতের বীজ উৎপাদন করছে। এর ফল নীলাভ কালচে সবুজ ও দীর্ঘ। হালকা সবুজ ও অপেক্ষাকৃত খাটো (৩০-৪০ সেমি) ফলধারী 'সাদা সাভারী' নামে আরো একটি জাত অনেকের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

তাছাড়া তিস্তা, তুরাগ, সুরমা, রূপসা, বিভিন্ন জাত এদেশে চাষ হয়।

বীজ বপনের সময়: শীতের দু'তিন মাস বাদ দিলে বাংলাদেশে বছরের যেকোনো সময় চিচিঙ্গা চাষ করা যায়। ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চিচিঙ্গার চাষ করলে সবচেয়ে ভালো ফলন হয়। তবে শীতকালে চাষ করলে গাছের বৃদ্ধি কম হওয়ায় ফলনও একটু কম হয়।

বীজহার: চিচিঙ্গার জন্য হেক্টর প্রতি ৪-৫ কেজি (১৬-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরী। কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভ্যাক্স/প্রোভ্যাক্স ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

পলিব্যাগে অর্ধেক গোবর ও অর্ধেক মাটি মিশিয়ে ভরে প্রতিটি পলিব্যাগে একটি করে চিচিঙ্গার বীজ পুঁতে চারা তৈরি করে নেয়া যায়। বীজের খোসা শক্ত হলে বীজ বোনার আগে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়। চারা ১৫ থেকে ২০ দিন বয়সের হলে তা জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

ক) রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপর শেড দিতে হবে।

গ) চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

ঘ) চিচিঙ্গার চারাগাছে 'রেড পাম্পকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়।

১.৫.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি- সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এরপর জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.০ মিটার এবং উচ্চতা ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে।

মাদা (গর্ত) প্রস্তুতকরণ- চিচিঙ্গার ক্ষেত্রে সারিতে ১.৫ মিটার দূরত্বে ৪০ সেমি x ৪০ সেমি x ৪০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে। বীজ বপন/ চারা রোপণের ১০ দিন আগে মাদা তৈরি করে নির্ধারিত সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান (প্রতি শতক)	জমি তৈরির সময় (প্রতি শতক)	প্রতি মাদায় সারের পরিমান				
			চারা রোপণের ১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পরে	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পরে
গোবর সার	৮০ কেজি	৪০ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	৯০০ গ্রাম	-	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	৫ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	১৮ গ্রাম	-	-		-
এমওপি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-		-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-		-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	২.৫ গ্রাম	-	-	-	-

বীজ/চারা বপন/রোপণ: চিচিঙ্গার বীজের ত্বক পুরু ও শক্ত বিধায় ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়। চিচিঙ্গার বীজ সরাসরি মাদায় (৪০X৪০X৪০ সেমি) বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন অথবা পলিব্যাগে উৎপাদিত ১৫-২০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত: ১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরী করে নিতে হবে। ৮-১২ দিনের মধ্যে বীজ গজায়।

১.৫.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: চিচিঙ্গার কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। এতে চিচিঙ্গার গুণগত মানও ভাল হয়। চারা ২০-২৫ সেমি লম্বা হলে চিচিঙ্গার জমিতে ১- ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচা বা বাউনি তৈরি করতে হয়।

আগাছা দমন: হাতিশুঁড় আগাছা দমন করতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা গজানো বা রোপণের পর থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: পানির অভাবে চিচিঙ্গা গাছে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- চারার বৃদ্ধি কমে যাওয়া, গাছ নেতিয়ে আসা, ফুল কম ফোটা ও ঝরে যাওয়া, ফল ঝরে যাওয়া, কচি ফল বড় না হওয়া ইত্যাদি। সেচ দিলে এসব সমস্যা কেটে যায়। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সার উপরিপ্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

মালচিং (আচ্ছাদন): বীজ বপনের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে বায়ু চলাচল সহজ করতে হবে। বর্তমানে প্লাষ্টিক মালচ ব্যবহার করা হচ্ছে।

শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে দিলে শারীরিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং আন্তঃকর্ষণের কাজে সহায়তা করে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর শাখা ভাঙ্গার কাজ শুরু করা যায়। এরপর ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার শাখা ছাঁটাই করা যায়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: অধিক ফলনের জন্য কৃত্রিম পরাগায়ণ অবশ্যই সকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে ৯.০০ ঘটিকার মধ্যেই সমাপ্ত করতে হবে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

ক) চিচিঙ্গার মাছি পোকা

এ পোকা লাউয়ের ফলের মধ্যে প্রথমে ডিম পাড়ে, পরবর্তীতে ডিম থেকে কীড়া বা বাচ্চা (Larva) বের হয়ে ফলের ভেতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।



চিত্র: মাছি পোকা আক্রান্ত চিচিঙ্গা



চিত্র: রেড পাম্পকিন বিটল পোকা

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

খ) রেড পাম্পকিন বিটল: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

গ) চারা গাছে কাটুই পোকার আক্রমণ: কাটুই পোকার আক্রমণ ঠেকাতে- "সাইকন" ১০ লি: পানিতে ২০ মিলি "সাইকন" মিশিয়ে বিকেল বেলা স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

ঘ) পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকাঃ এই পোকা পাতার উপর বসে রস চুষে খেয়ে পাতার উপর থেকে নিচ বরাবর সুড়ঙ্গ করে ফেলে। এর ফলে পুরো পাতাই আঁকাবাঁকা দাগের মত দেখায় এবং পরিশেষে পাতাটি মারা যায়।

দমন

টোপাম্যাক ৭০ ডব্লিউ জি কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমির জন্য ২ গ্রাম, মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। প্রবাহমান গুণসম্পন্ন হওয়ায় দ্রুত গাছের ভিতরে প্রবেশ করে ফলে আক্রান্ত ফসলের ভিতরে থাকা পোকা মারা যায়। টোপাম্যাক স্প্রে করার ১৪ দিনের মধ্যে ফসল খাওয়া যাবেনা। সকল ধরণের বালাইনাশক বিকেলে ব্যবহার করা উত্তম।

রোগবালাই দমন

ক) পাতা কোকড়ানো রোগ: এ রোগ হলে পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতা ছোট হয়ে যায়। পাতা হলদে হয়ে যায়, বয়স্ক পাতা শক্ত ও মচমচে হয় এবং গাছ খাটো হয়ে যায়। বাহক পোকার মাধ্যমে চিচিঙ্গার পাতা

কোকড়ানো রোগ হয়। তাই বাহক পোকা দমন-ই ভাইরাস ঠেকানোর একমাত্র উপায়। বাহক পোকা দমনে ব্যবহার করুন টোপাম্যাক ৭০ ডব্লিউ জি। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ শতক জমির জন্য ২ গ্রাম, একর প্রতি মাত্রা ৪০ গ্রাম, হেক্টর প্রতি মাত্রা ১০০ গ্রাম।

খ) হোয়াইট মোল্ডঃ এ রোগের আক্রমনে কান্ড ও ফলে সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায় এবং ওখান থেকে ফলটি পচে যায়। হোয়াইট মোল্ড দমনে ট্রিয় অত্যন্ত কার্যকরী ছত্রাকনাশক।



চিত্র: হোয়াইট মোল্ড রোগ

অধিক ফলন পেতে স্প্রে করুন "ফসলি গোল্ড" ২০ মিলি ফসলি গোল্ড ১০ লি: পানিতে মিশিয়ে প্রতি ২০-২৫ দিন পর পর স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

১.৫.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

চিচিঙ্গা সংগ্রহের সময় নির্ধারণ: চিচিঙ্গা তোলার সঠিক সময় হল ফলের চামড়া হলুদ রঙের কিছুটা দাগের সাথে সবুজ হয়ে যায় এবং জাতভেদে প্রায় ৭.৫ থেকে ১৫ সেমি (৩ থেকে ৬ ইঞ্চি) আকারের হয়।

ফসল সংগ্রহ: চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর চিচিঙ্গার গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। শাঁস নরম ও কচি থাকা অবস্থায় ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। চিচিঙ্গা জমি থেকে উঠানোর পর ২ দিন পর্যন্ত সজীব থাকে। চিচিঙ্গা গাছে বয়স্ক হলে ফেটে যায়। সবজি সংগ্রহের সময় যাতে আঘাত না পায় সেজন্য প্লাস্টিকের বাক্স বা ছালার বস্তা ব্যবহার করা যায়।

ফলন: উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে চিচিঙ্গার হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন (৮০-১০০ কেজি/শতাংশ)। সাধারণত হাত দিয়ে ধারালো চাকু দিয়ে করলা সংগ্রহ করতে হয়।

সংরক্ষণ: উপরে খড়ের ছাউনি এবং বাঁশ/পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে মাঝে মাঝে তার দেয়াল ও ছাদ পানি দিয়ে সে ঘরে ২/১ দিন রাখা যায়, কেননা তাতে ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা হয়।

১.৬ পটল (Pointed gourd)

পটল একটি জনপ্রিয় সবজি। পটল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সবজিসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের সর্বত্র পটল জন্মেনা অথবা জন্মানো হয় না। রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বগুড়া, পাবনা, যশোর, খুলনা এলাকায় বানিজ্যিকভাবে পটলের চাষ হয়। বসতবাড়িতে পটলের চাষ কদাচিৎ দেখা যায়। বাংলাদেশের মোট সবজির চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ পটল পুরণ করে থাকে।

১.৬.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

পটলের পরিচিতি ও ব্যবহার

পটল একটি দীর্ঘমেয়াদী ফসল, যা মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উৎপাদন করা যায়। শীত বেশি হলে গাছের কান্ড মারা যায়, কিন্তু এর কন্দাল শিকড় সুপ্ত অবস্থায় বেঁচে থাকে। পটল খরিপ মৌসুমের সবজি হলেও বর্তমানে সারাবছর ধরেই পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাজারে যখন অন্যান্য সবজি কম পাওয়া যায়। তখন পটল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পটলের পুরুষ ও স্ত্রীফুল আলাদা আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়। তরকারি, পটলের খোসার ভর্তা এবং ভাজি করে পটল খাওয়া হয়ে থাকে। পটল সহজেই হজম হয়। অনেকের ধারনা এটি গ্যাস্ট্রিক ও হৃদরোগের জন্য উপকারী।

বৈজ্ঞানিক নাম: বৈজ্ঞানিক নাম *Trichosanthes dioica.*

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য পটলে ৯৪% জলীয় অংশ, ৪.১ গ্রাম শ্বেতসার, ২.৪ গ্রাম আমিষ, ২০মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ১.৭ মিগ্রা লৌহ, ০.৩ মিগ্রা ভিটামিন বি-১, ০.০৩ মিগ্রা ভিটামিন বি-২, ২.০ মিগ্রা ভিটামিন সি, ক্যারোটিন ৭৯০ মাইক্রোগ্রাম রয়েছে।

উৎপত্তি: ভারত উপমহাদেশ পটলের উৎপত্তি স্থল।

জলবায়ু ও মাটি

প্রখর তাপমাত্রা ও প্রচন্ড রোদ পটল আবাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশি হলে ফুলের পরাগায়ন ব্যাহত হয়। পটল বেশ খরা সহিষ্ণু তবে পানির ঘাটতি দীর্ঘায়িত হলে ফলন কমে যায়। বন্যামুক্ত ও সুনিস্কাশিত পলি, দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটি পটল চাষের জন্য উত্তম। মাটির অম্লমান (pH) ৬.০-৬.৫ পটল চাষের জন্য উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: পটল একটি গ্রীষ্মকালীন সবজি।

জাত পরিচিতি

উচ্চ ফলনশীল জাত: বারি পটল-১, বারি পটল-২

স্থানীয় জাত: বালি, মুর্শিদাবাদী, কানাইবাঁশী ইত্যাদি।

বপন সময়

ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ৪-৫টি গিট বিশিষ্ট পটল লতা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসেও (আগাম) রোপণ করা যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পানের বরজে ছায়াদানকারী গাছ হিসেবে অক্টোবর মাসে পটল লাগানো হয়। চরাঞ্চলে বর্ষজীবী ফসল হিসেবে প্রতি বছর অক্টোবর মাসে পটল চাষ করা হয়।

চারা উৎপাদন

জমিতে রোপণের পর মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে শাখা কলম শুকিয়ে মারা যায়। এক্ষেত্রে পলিব্যাগে চারা গজিয়ে জমিতে রোপণ করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। প্রতি পলিব্যাগে ১ গিটবিশিষ্ট ২টি কাটিং রোপণ করে খড় বিছলির আস্তর দিয়ে তার উপর প্লাস্টিকের আবরণ দেয়া হয়। এতে যে চারা তৈরি হয় তাতে চারার জীবন কাল বৃদ্ধি পায় এবং ফলন ভালো হয়।



পটলের কাটিং	পলিব্যাগে মাটি ভরাটকরন মাটি ভরাটকরণ	রোপণের পর খড়ের আস্তরণ মাটি ভরাটকরণ	পটলের কাটিংকৃত চারা

চিত্র: পলিব্যাগে শাখা কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন

৪ দিন পর প্লাস্টিক অপসারণ করা হয়। ৫ দিন পর থেকে চারা গজানো শুরু হয়। ৫দিন পর খড় বিছলির আস্তর সরিয়ে দেয়া হয়। ৫-৮ দিনের মধ্যে প্রায় সব চারা গজিয়ে যায়।

বীজহার: লতা বা মোথার সংখ্যা একরে ৪,০০০টি (শতকে ৪০টি)।

১.৬.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ- জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষা করতে বেড করে পটলের মাদা তৈরি করতে হবে। জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের প্রস্থ ১.০০ মিটার এবং উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-২০ সেমি হবে। দুটি বেডের মাঝে ৫০ সেমি প্রশস্ত সেচ এবং নিকাশ নালা থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ/মাদা তৈরি-বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি ভিতরে মাদার কেন্দ্র ধরে ১.০ মিটার দূরে দূরে ৫০X৫০X৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমান	জমি তৈরির সময়	মাদায় প্রয়োগ	উপরিপ্রয়োগ		
				১ম কিস্তি রোপণের ২০ দিন পর	২য় কিস্তি রোপণের ৬০ দিন পর	৩য় কিস্তি রোপণের ৯০ দিন পর
গোবর/ কম্পোস্ট	২০ কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	-	-	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম			
এমওপি	৮০০ গ্রাম	-	-	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম	২০ গ্রাম

জিপসাম	৪০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	-	-	-	-
জিংক সালফেট	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	-	-	-	-
খৈল	২ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-	-

** পটলের ফলন প্রথম দিকে বেশি হয় এবং গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ফলনও কমতে থাকে। এ জন্য ফসল সংগ্রহের পর প্রতি মাসে, ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে গাছের চারপাশে ২০-৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০- ৩৫ গ্রাম টিএসপি ও ২০-৩০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করলে গাছে নতুন কুশি ও ফুল আসবে।

১.৬.৩ বীজ বপন/চারা রোপণ

বীজ, কন্দমূল, শাখা কলম/কাটিং (পুরাতন লতার খন্ড) দিয়ে পটলের বংশবিস্তার করা হয়। বীজ দ্বারা এর বংশবিস্তার করা হয় না কারণ- বীজের অংকোরদগম বা গজানো অনিয়মিত, শতকরা ৫০ ভাগ গাছ পুরুষ হয়। বীজ থেকে জন্মানো গাছে ফুল আসতে প্রায় ২ বছর সময় লাগে। অধিক ফলনের জন্য শাখাকলম (কাটিং) বা কন্দমূল ব্যবহার করা ভাল। কাটিং এর ক্ষেত্রে পরিপক্ক কান্ড ব্যবহার করা হয়। পটল গাছের কান্ড মারা গেলেও শিকড় জীবিত থাকে। ফলে এই শিকড় থেকেই আবার গাছ জন্মে। রোপণের আগে পটলের শিকড় গজিয়ে নিলে বেশি ভাল হয়।

সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ১৫ সেমি গভীরতায় জমি খনন করে কাটিং রোপণ করতে হবে। কাটিং লাগানোর আগে কাটিংয়ের অগ্রভাগ মাটির উপর রেখে গোড়া জমির মধ্যে চেপে লাগাতে হয় এবং অগ্রভাগকে খড় বা বিচালী দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। প্রায় ২ সপ্তাহ পর চারা বা সাকার বের হয়। মাদার মাটি খুঁড়ে একপার্শ্বে রেখে তাতে নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার ভালভাবে মিশিয়ে ঐ সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে এবং ৫-৭ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। পলিব্যাগে চারা করে মূল জমিতে আগষ্ট মাসে লাগানো হলে ডিসেম্বর মাসে ফলন পাওয়া যায়। কাটিং এর ক্ষেত্রে, প্রায় ১ বছর বয়সের মোটা আকারের লতা ৫০ সেমি বা একটু বেশি লম্বা করে কেটে নিয়ে রিংয়ের মতো করে পেঁচিয়ে মূল জমিতে বেড়ে লাগানো যায়। এতে ৪-৫টি গিট মাটির নিচে থাকে এবং একটি গিট মাটির উপরে থাকে।

রোপণদূরত্ব: সারি-সারির দূরত্ব ১.৫ মিটার এবং লতা-লতার দূরত্ব ১.০-১.৫ মিটার। চারা বা মোথা রোপণের সময় ১০ টি স্ত্রীগাছের জন্য ১টি পুরুষ গাছ সুষ্ঠু পরাগায়নের জন্য রোপণ করতে হবে এবং পুরুষ গাছগুলো সমান দূরত্বে ছড়িয়ে লাগাতে হবে। পুরুষফুল স্ত্রীফুলের ১৫-২০ দিন পর জন্মায়। তাই পুরুষগাছ স্ত্রীগাছের ১৫-২০ দিন আগে রোপণ করা উচিত।

১.৬.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: পটল লতানো প্রকৃতির উদ্ভিদ, তাই এগুলো মাটির উপর কিংবা খড় বিছিয়ে উৎপাদন করলে গায়ে সাদা সাদা ফ্যাকাশে বা হলুদ বর্ণের হয়ে পড়ে। এতে পটলের বাজারমূল্য এবং রফতানিযোগ্যতা কমে যায়। মাচা সাধারণত দুধরনের হয়- বাঁশের আনুভূমিক মাচা ও রশি দিয়ে তৈরি উলম্ব মাচা। প্রতি মাদার

জন্য ১টি করে মাচা দেওয়া হলে ফসলের পরিচর্যা ও পটল সংগ্রহ সুবিধা হয়। পটল গাছ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জমিতে মাচা তৈরি করে এর গোড়ায় বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি পুঁতে মাচায় তুলে দিতে হবে।
মাচার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে বেডের সমান এবং মাচার উচ্চতা হবে। ভূমি হতে ৮০ থেকে ১০০ সেমি। পটলের আকর্ষি তুলনামূলক ছোট হওয়ায় ছাউনি যত চিকন আকারের দেয়া যায় ততই ভাল। খাড়া বা উলম্ব মাচার ক্ষেত্রে, ৩ বেড পর পর একটি করে ২ মিটার উচ্চতার বাঁশের খুঁটি বসাতে হয়। মাটি হতে ৫০ সেমি উপরে রশির দ্বারা তৈরি ১.৫ মিটার উচ্চতার জালে (ছিদ্র ৫- ৭ সেমি আকারের) পটলের লতা বাইতে দেয়া হয়। বাউনি থেকে লতা সরে গেলে মাঝে মাঝে বাউনিতে পটলের লতা তুলে দিতে হয়।

আগাছা দমন: পটলের জমিতে সাধারণত হেলেঞ্চা, দূর্বা, দন্ডকলস এসব আগাছার উপদ্রব দেখা যায়। এসব আগাছা জমি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে পটল গাছকে দুর্বল করে দেয় এবং ফলন কমে যায়। মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে গাছের গোড়ার চারিদিকের মাটি আলগা করা ও আগাছা দমন করা উচিত। পটল গাছ একাধিক বছর বাঁচে, সেজন্য প্রথম বার ফসল সংগ্রহের পর গাছের যত্ন নিতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: পানির অভাবে পটল গাছে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- চারার বৃদ্ধি কমে যাওয়া, গাছ নেতিয়ে আসা, ফুল কম ফোটা ও ঝরে যাওয়া, ফল ঝরে যাওয়া, কচি ফল বড় না হওয়া ইত্যাদি। সেচ দিলে এসব সমস্যা কেটে যায়। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সার উপরিপ্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

মালচিং (আচ্ছাদন): পটল বপন করা বা চারা লাগানো হয় শুকনা মৌসুমে। তাই কলম বা চারা লাগানোর পর মাদায় বা গাছের গোড়ায় খড় বিছিয়ে দেয়া উচিত। মালচিং মাদায় আর্দ্রতা সংরক্ষণে সহায়তা করে।

প্রুনিং বা অংগছাঁটাই: পটল গাছ মাচায় উঠার আগ পর্যন্ত পার্শ্বশাখা ছাঁটাই করে দিতে হবে। পরবর্তিতে প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর মরা, রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত পাতা ও শাখা ছাঁটাই করতে হবে। এতে ফলধারী নতুন শাখার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ফলন বেশি হয়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: চারা লাগানোর ৯০ দিনের মাথায় পটলের ফুল আসতে শুরু করে। পটলের পরাগায়ন বাতাস ও কীটপতঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়। পরাগায়ন না হলে ফুল শুকিয়ে ঝরে যায়। জমিতে শতকরা ৫-১০ ভাগ পুরুষ গাছ সুষম দূরত্বে থাকলে অধিক পরাগায়নের সম্ভাবনা থাকে। পরাগায়নের সময়কাল ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা। পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে পুংকেশর ঠিক রেখে পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ে সদ্যফোটা স্ত্রীফুলের গর্ভমুন্ডে লাগিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করা যায়। এছাড়া পুরুষ ফুলের পরাগরেণু পানিতে মিশিয়ে ড্রপার দিয়ে এক

ফোঁটা করে প্রতি স্ত্রীফুলের গর্ভমুন্ডে লাগিয়েও ভাল ফল পাওয়া যায়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৮-১০টি স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করা যায়।

মুড়ি ফসল হিসেবে পটল

পটল গাছ থেকে প্রথম বছর ফসল সংগ্রহ করার পর গাছের গোড়া নষ্ট না করে রেখে দিয়ে পরবর্তী বছর পরিচর্যার মাধ্যমে গুড়ি চারা থেকে যে ফসল পাওয়া যায়, তাকেই মুড়ি ফসল বলে। উঁচু জমিতে পটলের মুড়ি ফসল করা হয়। এক্ষেত্রে অক্টোবর মাসে পটলের জমির আগাছা ও শুষ্ক পুরনো লতা ছেটে দেয়া হয়। কোদাল দিয়ে জমি কুপিয়ে দিতে হয়। এতে গাছ নতুনভাবে হয়। মুড়ি ফসলে মূল ফসলের অনুরুপ সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে হয়। মুড়ি ফসলে মূল ফসলের চেয়ে বেশি ফলন হয়। পটল গাছ একবার লাগালে ৩ বছর পর্যন্ত ফলন দিয়ে থাকে। পটল গাছে প্রথম বছর কম ফলন হয়। দ্বিতীয় বছর ফলন বেশি হয়, তৃতীয় বছর ফলন কমতে থাকে। একবার লাগানো গাছ ৩ বছরের বেশি রাখা উচিত নয়।

পোকামাকড় দমন

পটলের ক্ষেত নিয়মিত পরিষ্কার রাখলে পোকামাকড়, রোগবালাইয়ের তেমন একটা আক্রমণ হয়না। তারপরও মাছি পোকা, কাঁঠালে পোকা, মিলিবাগ, উইপোকা ও কুমড়ার বিটল পোকার আক্রমণ হতে পারে। পরিচ্ছন্ন চাষ, ছাই, সেক্স ফেরোমন, বিষটোপ ইত্যাদির ব্যবহার ও বন্ধুপোকার সংখ্যা বাড়িয়ে এগুলো সহজেই দমন করা যায়।

পটলের রোগ

ক) নেমাটোড বা শিকড়ের গিট রোগ

পটলের নেমাটোড বা শিকড়ের গিট জাতীয় রোগ মারাত্বক সমস্যা। এর আক্রমণে গাছে ছোট-বড় অনেক গিটের সৃষ্টি হয়। ফলে এদের মূল নষ্ট হয়ে খাবার নিতে পারেনা। গাছ দুর্বল ও খাটো হয়ে পড়ে। ফলন মারাত্বক কমে যায়।

দমন

১. সরিষা, মরিচ, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দ্বারা ফসল চক্র করে নেমাটোড রোগ নিয়ন্ত্রনে রাখা সম্ভব।
২. পটল রোপণের ২০-২৫ দিন পূর্বে ১৫-২০ কেজি মুরগির বিষ্ঠা বা সরিষার খৈল ১.৫-২.০ কেজি মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
৩. লতা লাগানোর সময় প্রতি শতকে ফুরাডান ৫জি বা কুরাটার ৫জি ১২৫-১৬০ গ্রাম এবং পরবর্তী ৪ মাস পর পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ রোগ

পাতার উপরের দিকে ও কান্ডে সাদা পাউডারের মতো ছত্রাকের জীবাণুর প্রলেপ পড়ে এবং পরে ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে সম্পূর্ণ পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন

১. আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়ে ফেলতে হবে।

২০২৫

২. পরিমিত সার, সেচ প্রয়োগ করতে হবে।
৩. থিওভিট (০.২% বা ২ গ্রাম/লিটার পানি) বা টিল্ট (০.১% বা ১ মিলি/লিটার পানি) রোগ দেখা মাত্র ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

কচি অবস্থায় সকাল অথবা বিকালে পটল সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত জাতভেদে ফুল ফোটার ১০-১২ দিনের মধ্যে পটল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফসল এমন পর্যায়ে সংগ্রহ করা উচিত যখন একটি ফল পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু বেশি পরিপক্ক হয়নি। বেশি পরিপক্ক ফলের বীজ বেশি হয় এবং বীজ শক্ত হয়ে খাওয়ার অনুপয়োগী হয়ে যায়।

পটল সংগ্রহ-মৌসুম বেশ দীর্ঘ। পটল গাছে ফেব্রুয়ারি থেকে ফল ধরা শুরু হয়ে অক্টোবর পর্যন্ত ৯ মাস সংগ্রহ করা যায়। সপ্তাহে কমপক্ষে ১বার ফল সংগ্রহ করে বাজারজাত করা উচিত। ফলন ১২-১৫ টন/একর (১২০-১৫০কেজি/শতক)।

১.৭ কাঁকরোল (Teasel gourd)

কাঁকরোল কুমড়া গোত্রীয় সবজি হলেও এ গোত্রের অন্যান্য সবজির চেয়ে কাঁকরোল আলাদা। এর খোসার ছোট ছোট ঘন নরম কাঁটায় ভরা। কাঁকরোল এক ধরনের ছোট সবজি যা সাধারণত গ্রীষ্ম-বর্ষায় এদেশে কাঁকরোল হয়। কাকরোলের বীজ কাকরোল গাছের নিচে হয়ে থাকে যা দেখতে মিষ্টি আলুর মত। নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সাভার, যশোর প্রভৃতি জেলায় কাঁকরোল বেশি হয়।

১.৭.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

কাঁকরোলের পরিচিতি ও ব্যবহার: কাঁকরোল লতানো প্রকৃতির গুল্ম স্বভাবের গাছ। এদেশে দু ধরনের কাঁকরোল দেখা যায়-কাঁকরোল ও বন কাঁকরোল। কাঁকরোল চাষ করা হয়, বন কাঁকরোল হয় বনে-জঙ্গলে। কাঁকরোলে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা গাছে উৎপন্ন হয়।

কাঁকরোলের ব্যবহার প্রধানত সবজি হিসেবে। এ গাছের কচি ফল ভাজি, ভর্তা ও তরকারি হিসেবে রান্না করে তবে কোন কোন দেশে কাঁকরোলের মূলও আলুর মতো খাওয়া হয়। শরীরের জন্য কাঁকরোল বেশ উপকারী ও পুষ্টিকর। কাঁকরোল খেলে দেহে শক্তি আসে। কাঁকরোলে উচ্চ মাত্রায় লাইকোপেন আছে। ব্যথা, ফোলা ও ক্ষত সারাতে কাঁকরোল ব্যবহৃত হয়। কাঁকরোল নিয়মিত খেলে প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কমে যায়। ত্বক ও চোখের জন্য কাঁকরোল খাওয়া ভালো।

বৈজ্ঞানিক নাম: কাঁকরোলের বৈজ্ঞানিক নাম *Momordica dioica.*

পুষ্টিমান: কাঁকরোলের ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৮৪% জলীয় অংশ, ৭.৭ গ্রাম শ্বেতসার, ৩.১ গ্রাম আমিষ, ৩ গ্রাম আঁশ ও ১.১ গ্রাম বিভিন্ন খনিজ উপাদান রয়েছে। অল্প পরিমানে বিভিন্ন ধরণের ভিটামিনও আছে। কাঁকরোল প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, লৌহ, ভিটামিন বি-২ ও ক্যারোটিন আছে।

উৎপত্তি: ভারত উপমহাদেশ কাঁকরোলের উৎপত্তিস্থল ।

জলবায়ু ও মাটি: কাঁকরোলের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। শীতকালে নিম্ন তাপমাত্রায় মোথা বা কন্দমূল গজায় না, গাছের বৃদ্ধিও হয় না। শীতশেষে তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকে তখন গাছ গজাতে ও বাড়তে শুরু করে। বন্যামুক্ত ও সুনিষ্কাশিত উঁচু থেকে কিঞ্চিত উঁচু অম্লময় দো-আঁশ থেকে এঁটেল দো-আঁশ মাটি কাঁকরোল চাষের জন্য উত্তম। তবে জৈব সার যোগ করে অন্যান্য মাটিতে কাঁকরোল চাষ করা যায়। কাঁকরোল জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না।

মাটির অম্লমান (pH) ৬.০-৬.৫ কাঁকরোল চাষের জন্য উত্তম।

উৎপাদন মৌসুম: কাঁকরোল একটি গ্রীষ্মকালীন সবজি।

জাত পরিচিতি

আমাদের দেশে কাঁকরোলের বিভিন্ন প্রকারের জাত আছে। এসব জাতের মধ্যে আসামি, মণিপুরি, মুকুন্দপুরি ও মধুপুরি অন্যতম। এ সকল জাতের ফলগুলো খেতে বেশ সুস্বাদু এবং ফলনও বেশি হয়।

আসামী: এ জাতের ফলগুলো সুস্বাদু, গোলাকার ও বেঁটে হয়ে থাকে।

মণিপুরী: এ জাতের ফল লম্বাটে ও অপেক্ষাকৃত চিকন, তবে ফলন বেশী দিয়ে থাকে।

বপন সময়

ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত কাঁকরোল চাষের জন্য উপযুক্ত সময়।

চারা উৎপাদন

বীজ থেকে কাঁকরোলের চারা তৈরি করা যায়। কিন্তু তা না করাই ভালো। কেননা বীজ থেকে মাত্র ৫০% চারা গজাতে পারে। তাছাড়া বীজ থেকে গজানো চারার বেশির ভাগ গাছই পুরুষ গাছ হয়ে থাকে। এছাড়াও বীজ থেকে গজানো গাছের ফলন কম হয় এবং জাতের গুনাগুণ ঠিক থাকে না। সেজন্য কন্দ বা মোথা থেকে কাঁকরোলের চারা তৈরি বা বংশবিস্তার করা হয়। গাছের আগা কেটে বালি বা মাটির মধ্যে ছায়া জায়গায় পুঁতে দিলে ১০-১৫ দিনের মধ্যে চারা হয়। কাটিং এর গোড়ায় শিকড় গজানো হরমোন লাগিয়ে দিলে দ্রুত শিকড় গজায়। তবে এতো ঝামেলা না করে জমিতে মাদা তৈরি করে সরাসরি কন্দমুল লাগানো উত্তম।

বীজহার: হেক্টরপ্রতি প্রতি মাদার সংখ্যা হবে ২০০০টি (শতকে ২০টি)।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন- পানি নিষ্কাশন ও সেচ সবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন- উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ: জমিতে ভালোভাবে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করে জমির উপরিভাগ সমান করে নিতে হবে। শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। তারপর চাষকৃত জমিতে প্রয়োজনীয় মাপের বেড তৈরী করে নিতে হবে। জমি অব্যশই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ/মাদা তৈরি: বেড তৈরির ক্ষেত্রে প্রস্থ নিতে হবে ২ মিটার ও জমির দৈঘ্য অনুযায়ী লম্বা করতে হবে। দুই বেডের মাঝে নালার প্রস্থ ও গভীরতা হবে যথাক্রমে ৩০ সেমি এবং ২০

সেমি। প্রতিটি বেডে ২ টি করে সারি রাখতে হবে। বেডে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২ মিটার। কাঁকরোল মাদায় চাষ করা ভাল। প্রতিটি সারিতে ৬০X৬০X৬০ সেমি আকারের গর্ত করে মাদা তৈরী করে নিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

কাঁকরোলের শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে খাবার সংগ্রহ করে। সেজন্য প্রচুর খাবার সরবরাহ করতে হবে।

সারের নাম	মোট পরিমান (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি)	মাদায় প্রয়োগ (চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে)	উপরিপ্রয়োগ			
				১ম কিস্তি রোপণের ১০-১৫ দিন পর	২য় কিস্তি রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	৩য় কিস্তি রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	৩য় কিস্তি রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
গোবর/ কম্পোস্ট	৮০ কেজি	২০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	১২০০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
টিএসপি	৯৫০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-	-	-
এমওপি	৭০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	২০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	-	৮ গ্রাম		-	-	-

মোথা লাগানোর ১৫ দিন পূর্বে মাদায় সার, গোবর ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। মোথা লাগানোর আগে সব উপকরণ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

১.৭.৩ বীজ বপন/চারা রোপণ

মাদায় ৪-৬ সেমি গভীরে কন্দমুল পুঁততে হবে। তারপর মাটি দিয়ে মাদা ঢেকে তার ওপর খড় বিছিয়ে দিতে হবে যাতে মাদার মাটি শুকিয়ে না যায়। প্রয়োজনে ২/১ দিন পর পর ঝাঁঝরি দিয়ে মাদায় সেচ দিতে হবে। রস না থাকলে কন্দ গজাবে ন আর বেশি রস থাকলে কন্দ পচে যাবে। রোপণের জন্য নির্বাচিত মোথার ৫% পুরুষ গাছের মোথা হতে হবে। কেননা কাঁকরোলের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে জন্মে, তাই পরাগায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্ত্রী গাছের পাশাপাশি আনুপাতিক হারে পুরুষ গাছ থাকা দরকার। পুরুষ গাছে স্ত্রী

গাছের তুলনায় দেরিতে ফুল আসে। পুরুষ ফুল স্ত্রী ফুলের ১৫-২৯ দিন পর জন্মায়। তাই স্ত্রী গাছের মোথা লাগানোর ১৫-২০ দিন আগে পুরুষ গাছের মোথা লাগাতে হবে।

রোপণ দূরত্ব: সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২ মিটার ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ২ মিটার। আবার মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২.৫ মিটার।

১.৭.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): বপনের ৮-১০ দিনের মধ্যে বীজ না গজালে বা চারা মারা গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া: অধিক ফলনের জন্য গাছ ১০-১৫ সেমি হলেই উঁচু বাউনি/মাচা দিতে হবে। কাঁকরোলের গাছ ১০-১৫ সেমি লম্বা হলে গাছের গোড়ায় ১ টি করে কাঠি পুঁতে দিতে হবে। গাছ ৫০ সেমি লম্বা হলে মাচা করে দিতে হবে।

আগাছা দমন: মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করা ও আগাছা দমন করা উচিত। পটল গাছ একাধিক বছর বাঁচে, সেজন্য প্রথমবার ফসল সংগ্রহের পর গাছের যত্ন নিতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে। গাছের গোড়ার ১০-১৫ সেমি দূরে মাদার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য প্রচুর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। মাদার মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই সেচ দিতে হবে। সাধারণত: খরার সময় সেচ দিতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হলে আর সেচ দিতে হয় না। তখন নিকাশ নালার ঘাস পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি সহজে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সার উপরিপ্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

মালচিং (আচ্ছাদন): কন্দমূল জমিতে লাগানোর পর ধানের খড় দিয়ে মাদা ঢেকে দিতে হবে। শীতকালে কাঁকরোলের মোথা মাটির নিচে পড়ে থাকে যা নষ্ট না করে ঐ বেডে অন্য রবি ফসলের চাষ করতে হবে। মোথা বা কন্দমূলের উপর কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিলে পরে এ থেকে অগ্রীম ফসল পাওয়া যাবে।

অংগ ছাঁটাই: ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি বেশি হয়ে গেলে ফল উৎপাদন কম হয়। এজন্য গাছের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও ফলায়নকে উৎসাহিত করতে অতিরিক্ত শাখা-প্রশাখা কেটে দিতে হবে। এছাড়া রোগ ও পোকাক্রান্ত পালপালা, লতা-পাতা কেটে গাছ ছাঁটাই করে দিতে হয়।

কৃত্রিম পরাগায়ন: ১৫-২০ দিন পূর্বে লাগানো পুরুষ ফুল দিয়ে স্ত্রীফুল ফোটার ১২ ঘন্টার মধ্যে পরাগায়ন করতে হবে।

পোকামাকড় দমন

ক) কাকরোলের ফলের মাছি পোকা: সেক্স ফেরোমন, বিষটোপ ও বন্ধু পোকার সংখ্যা বাড়িয়ে এগুলো সহজেই দমন করা যায়।

খ) কাঁকরোলের ফল ছিদ্রকারি পোকা: কাঁকরোলের ফল ছিদ্রকারি পোকার পোকার কীড়া কচি ফল ও ডগা ছিদ্র করে ও ভিতরে কুরে কুরে খায়। এরা ফলের কুঁড়িও খায় ।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা

১। ক্ষেত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।

২। আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে।

৩। চারা রোপনের ১৫ দিন পর থেকে ক্ষেত ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ করতে হবে ।

৪। জৈব বালাইনাশক ব্যবহার যেমন নিমবিসিডিন ৩ মিঃলিঃ / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা ।

৫। শতকরা ১০ ভাগের বেশি ক্ষতি হলে যে কোন একটি বালাইনাশক ব্যবহার করা । যেমন রিপকর্ড ১ মিঃলিঃ বা ডেসিস ০.৫মিলি বা ফাসটেক ০.৫ মিঃলিঃ বা সবিক্রণ -২ মিঃলিঃ বা সুমিথিয়ন-২ মিঃলিঃ বা ডায়াজিনন ২ মিঃলিঃ /লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা স্প্রে করার পর ৭-১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

পরবর্তী মৌসুমে করনীয়ঃ ১। আগাম বীজ বপন করতে হবে। ২। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

গ)) কাঁকরোলের জাব পোকা: পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা: লাউয়ের দমন পদ্ধত্তির অনুরূপ।

ঘ) কাকরোলের সাদা মাছি পোকা: এরা পাতার রস চুষে খায় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, পাতায় অসংখ্য সাদা সাদা পাখাযুক্ত মাছি দেখা যায়, ঝাকি দিলে পোকা উড়ে যায় ।

ব্যবস্থাপনা

১। সাদা আঠাযুক্ত বোর্ড স্থাপন বা আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

২। নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে।

৩। ৫০ গ্রাম সাবানের গুড়া ১০ লিটার পানিতে গুলে পাতার নিচে সপ্তাহে ২/৩ বার ভাল করে স্প্রে করতে। সাথে ৫ কৌটা গুল (তামাক গুড়া) পানিতে মিশিয়ে দিলে ফল ভাল পাওয়া যায়।

৪। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। যেমন এডমায়ার ০.৫ মিলি বা ০.২৫ মিলি ইমিটাফ বা ২ মিলি টাফগর/রগব/সানগর প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা: স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না ।

করনীয়: ১। আগাম বীজ বপন করতে হবে। ২। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) কাঁকরোলের রেড পাম্পকিন বিটল

পাম্পকিন বিটলের পূর্ণ বয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে। এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে।

পরিবেশ বান্ধব দমন ব্যবস্থাপনা: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

কাঁকরোলের রোগ দমন

কাঁকরোলের যে সকল রোগ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- চারার ঢলে পড়া, পাউডারী মিলডিউ, ডাউনি মিলডিউ, সুটি মোল্ড, মোজাইক। প্রথম ৪টি ছত্রাকজনিত রোগ এবং শেষোক্তটি ভাইরাস জনিত রোগ।

ক) চারার ঢলে পড়া রোগ

১) এ রোগের আক্রমণে কচি গাছের গোড়া পঁচে যায়।

২) চারা ঢলে পড়ে ও মার যায়।

প্রতিকার

১) পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) রোগমুক্ত কাঁকরোলের মোথা লাগাতে হবে।

৩) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়ে ফেলতে হবে।

খ) পাউডারি মিলডিউ রোগ: পাতার উপরের দিকে ও কান্ডে সাদা পাউডারের মতো ছত্রাকের জীবাণুর প্রলেপ পড়ে এবং পরে ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে সম্পূর্ণ পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন: লাউয়ের দমন পদ্ধতির অনুরুপ।

গ) ডাউনি মিলডিউ রোগ: বয়স্ক পাতায় এ রোগ প্রথম দেখা যায় আক্রান্ত পাতার গায়ে সাদা বা হলদে থেকে বাদামী রংগের তালির মত দাগ দেখা যায় ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ।

ব্যবস্থাপনা

১। সম্ভব হলে গাছের আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে ।

২। ক্ষেত পরিস্কার এবং পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩। (ম্যানকোজেব+মেটালেক্সিল) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: পুটামিল বা রিডোমিল গোল্ড অথবা (ম্যানকোজেব+ ফেনামিডন) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: সিকিউর ২ গ্রাম/ লিটার হারে অথবা সালফার গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: কুমুলাস ২ কেজি/ হেক্টর হারে অথবা মনোভিট বা ম্যাকভিট ২ মিলি. / লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা:

১। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

২। আক্রান্ত ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না।

৩। এলোপাথাড়ি বালাইনাশক ব্যবহার করে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করা উচিত নয়।

করনীয়

১। প্রথম বার লক্ষণ দেখা যেতেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। আগাম বীজ বপন করলে আক্রমণ কিছুটা কমবে।

৩। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

৪। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি উদ্ভাবিত/ অন্যান্য উন্নত জাতের চাষ করতে হবে।

৫। বিকল্প পোষক যেমন: আগাছা পরিস্কার রাখতে হবে।

১০২৬ **ঘ) কাঁকরোলের সুটিমোল্ড রোগ:** এ রোগের আক্রমনে পাতায়, ফলে ও কান্ডে কালো ময়লা জমে। খোসা পোকা বা সাদা মাছির আক্রমন এ রোগ ডেকে আনে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১। আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস করতে হবে।

২। টিল্ট ২৫০ ইসি ১০ লি. পানিতে ৫ মি.লি. মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা:

১। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সেই সবজি খাওয়া বা বিক্রি করা যাবে না।

২। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না ।

করনীয়

১। আগাম বীজ বপন করতে হবে। ২। সুষম সার ব্যবহার করতে হবে। ৩। রোগ প্রতিরোধী জাত বা উন্নত জাতের চাষ করতে হবে।

রেটুন কাকরোল

শীতের শুরুতেই কাকরোল গাছ মরে যায় এবং পরবর্তী বর্ষা না আসা পর্যন্ত মাটির নিচে মোথা বা শিকড় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, যা থেকে পরের বছর আবার সঠিকভাবে যত্ন নিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এভাবে কাঁকরোল চাষ করলে বীজের খরচ, রোপণ এবং রোপণ পরবর্তী খরচ অনেকাংশে কমে যায় এবং বেশি লাভবান হওয়া যায়।

১.৭.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

কাঁকরোলের সংগ্রহের সময় নির্ধারণ: ফল কচি অবস্থায় অর্থাৎ বীচি শক্ত হওয়ার পূর্বে সংগ্রহ করতে হয়। কাঁকরোল হলদে সবুজ হলে সংগ্রহ করতে হয়। গাছ রোপণের দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে কাঁকরোল ফুল ফুটা আরম্ভ করে। পরাগায়নের ১২-১৫ দিনের মধ্যে কাঁকরোল সংগ্রহের উপযোগী সময়। মধ্য জুলাই হতে মধ্য সেপ্টেম্বর মাস কাঁকরোল সংগ্রহের উত্তম সময়।

ফসল সংগ্রহ: চাকু দিয়ে কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন: ভালোভাবে যত্ন নিলে জাতভেদে হেক্টরপ্রতি কাঁকরোলের ২৫ থেকে ৩০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায় (শতকে ১০০-১২০ কেজি)।

বাজারজাতকরণ: কাঁকরোল সংগ্রহের পরপরই আকার অনুসারে গ্রেডিং করা হয়। গ্রেডিংকৃত কাঁকরোল প্যাকিং করে ২-৩ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা হয়। কাঁকরোল বস্তাবন্দী না করে বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত প্লাস্টিক, কাঠ বা বাঁশের খাঁচা বা হার্ডবোর্ড বা করোগেটেড (Corrugated) হার্ডবোর্ডের বাক্সে করে বাজারে পাঠাতে হয় যাতে গায়ে আঘাত না লাগে।

সংরক্ষণ: উপরে খড়ের ছাউনি এবং বাঁশ/পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে মাঝে মাঝে তার দেয়াল ও ছাদ পানি দিয়ে সে ঘরে কয়েকদিন রাখা যায়, কেননা তাতে ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

- দিনের বেলায় ২৫-২৮° সে. এবং রাতের বেলায় ১৮-২০° সে. লাউ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।
- লাউ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং অনেক লম্বা সময়ব্যাপী ফলন দেয়।
- লাউ ও মিষ্টিকুমড়া ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল।
- হাতিশুঁড় আগাছ পাউডারি মিলডিউ রোগের বিকল্প পোষক ও পানি লং আগাছা লাউয়ের মোজাইক রোগের বিকল্প পোষক।
- লাউ ও মিষ্টিকুমড়াগাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো সিকেচার/ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।
- লাউয়ের কৃত্রিম পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং মিষ্টিকুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ন সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে করা উত্তম।
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে।
- শসার ফুল সহবাসী (Monoecious) অর্থাৎ একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে উৎপন্ন হয়।
- করলায় কিউকারবিটাসিন নামক রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির কারনে স্বাদ তিতা হয়।
- চাষকৃত চিচিঙ্গার ফল লম্বা, কিন্তু বুনো চিচিঙ্গার ফল খাটো হয়।
- এক একর জমিতে পটল চাষের জন্য ৪,০০০টি লতা বা মোথার প্রয়োজন হয়।
- সাদা মাছি পোকার আক্রমনের কারণে কাঁকরলের শুটি মোল্ড রোগ হয়।
- কাঁকরোলে উচ্চ মাত্রায় লাইকোপেন আছে যা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি **কিউকারবিটেসি গোত্রের সবজি চাষ** সম্পর্কেজেনেছে। নিম্ন ছকে কয়েকটি **সবজি**র ছবি উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে সবজি ফসলের নাম এবং বপনের সময় উল্লেখ কর।

ক্র/নং	সবজির নাম	ছবি দেখে উত্তর লিখ	বপনের সময়
১			

২			
৩			
৪			

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

তুমি এই অধ্যায়ে কুমড়াজাতীয় মাছি পোকা দমনে পরিবেশবান্ধব দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনেছে। তারই অংশ হিসেবে তুমি কুমড়াজাতীয় ফসলে বিষটোপ ফাঁদ তৈরি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পেরেছ। তুমি তোমার প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে কৃষকরা মাছি পোকা দমনে কি কি দমন ব্যবস্থা নিচ্ছে তার বিবরণ দাও। কৃষকরা এ পোকা দমনে বিষটোপ ব্যবহার করে কিনা? যদি করে থাকে তবে বিষটোপ তারা কিভাবে তৈরি ও ব্যবহার করে সেই সম্পর্কে চিত্রসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

২০২৫

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১। লাউয়ের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
২। লাউ চাষের উপযোগী তাপমাত্রা কত?
৩। লাউয়ের ২টি জাতের নাম লিখ।
৪। পরাগায়নের কতদিন পর লাউ সংগ্রহের উপযোগী হয়?
৫। মিষ্টিকুমড়ার জমিতে জন্মে এমন ৪টি আগাছার নাম লিখ।
৬। শসা ও খিরার পার্থক্য কি?
৭। চিচিঙ্গার ২টি জাতের নাম লিখ।
৮। চারা গজানোর কতদিন পর চিচিঙ্গা গাছে ফল আসে?
৯। কোন কোন জেলায় করলার আবাদ বেশি হয়?
১০। কাঁকরোলে স্ত্রী ফুল ফোটার কত ঘন্টার মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নঃ

১। প্রতি ১০০ গ্রাম লাউয়ে কিকি খাদ্য উপাদান আছে?
২। লাউ গাছে কৃত্রিম পরাগায়ন কিভাবে করা হয়?
৩। মাছি পোকা দমনে বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪। মিষ্টিকুমড়ার পরিপক্কতা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?
৫। শসা জন্মানোর জন্য উত্তম তাপমাত্রা কত ও কি ধরনের মাটিতে শসা ভাল জন্মে?
৬। করলার ঔষধী গুণ বর্ণনা কর।
৭। উচ্ছে ও করলার মধ্যে পার্থক্য কি?
৮। বীজ দ্বারা পটলের চারা করা যায় না কেন?
৯। পটল ক্ষেতে পানির অভাব হলে কি কি লক্ষণ দেখা দেয়?
১০। কাঁকরোলে পুরুষ ও স্ত্রী মোথা একই সঙ্গে রোপণ করা হয় না কেন?
১১। রোপণের কতদিন পর কাঁকরোলের ফুল হয় এবং কতদিন পর ফল সংগ্রহ করে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। লাউ ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।
২। লাউয়ের চারা রোপণ এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৩। কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছিপোকা দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। শসার চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫। করলা চাষে সার প্রয়োগ, আন্ত: পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।
৫। পটলের বংশবিস্তারের মাধ্যম কি? পটলের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৬। কাঁকরোলের বিভিন্ন বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখ।

জব ১.১ মিষ্টিকুমড়া চাষাবাদে দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।
২. মাদা তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।
৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ, চারার পরিচর্যা ও বালাই দমন করতে পারবে।
৪. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পুর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী(পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দিতে হবে।

ব্যক্তিগতসুরক্ষাসরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া
০৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

মিষ্টিকুমড়া চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্রযুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি, ২। বীজ বা চারা, ৩। কোদাল, ৪। লাঙ্গল, ৫। মই, ৬। নিড়ানী, ৭। আঁচড়া, ৮। খুটি, ৯। রশি, ১০। টেপ, ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। ওজন মাপার যন্ত্র, ১৩। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি, ১৪। ঝাঁঝরি, ১৫। খন্তা, ১৬। সিকেচার বা ব্লেড, ১৭। টুকরি, ১৮। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২। ফেব্রুয়ারি-মে মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতকপ্রতি ৪-৬ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

৩। জমির পাশে উঁচু স্থানে ৩ X ১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে।

৪। মূল জমিতে প্রতিশতকে ১০ কেজি জৈব সার, ৩৫০ গ্রাম টিএসপি সার, এমওপি ২০০ গ্রাম, জিপসাম ৪০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৫০ গ্রাম, বোরাক্স ৪০ গ্রাম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। ৩ মিটার প্রস্থ ১৫-২০ সেমি উচ্চতায় বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৬০ সেমি সেচ ও নিকাশ নালা রাখতে হবে।

৫। চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে বেডের যেদিকে ৬০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দেয়া হবে।, উহার পার্শ্ববর্তী বেডের ঠিক একই কিনার থেকে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২.৫ মিটার দূরে দুরে এক সারিতে ৫০-৫৫ সেমি X ৫০-৫৫ সেমি X ৪৫-৫০ সেমি আকারের মাদা তৈরি করতে হবে। সারির অপর পার্শে ২ মিটার খালি জায়গায় লতা বাইবার সুযোগ পাবে।

৬। প্রতি মাদায় ৫ কেজি জৈব সার এবং ৬০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম এমওপি, ৪০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড রাসায়নিক সার প্রয়োগ মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৭। মাটিতে 'জো' এলে পরের দিন মাদার মাটি ভালভাবে ওলটপালট করে দিতে হবে। অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ ১৫-১৬ দিনের চারা বিকেল বেলায় প্রতি মাদায় ১টি করে রোপণ করতে হবে এবংঝাঁঝরি দিয়ে নিচু করে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে।

৮। লাউ যখন ১৫-২৫ সেমি লম্বা হবে তখনই মাচা দিতে হবে। এজন্য লাউয়ের জমিতে ১.৭ মিটার উঁচু করে মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হয় এবং কোন চারা মারা গেলে পুনরায় রোপণ করতে হবে।

৯। মিষ্টিকুমড়া পানির প্রতি খুবই সংবেদশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরুপ মাটি শুকায়ে গেলে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০। বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারনে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে।মাদায় বা বেডে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠায়ে দিতে হবে।

১১। প্রতি মাদায় নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও এমওপি সারের উপরিপয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবেঃ

সারের নাম	প্রতি মাদায় সারের উপরি-প্রয়োগ (গ্রাম)			
	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
ইউরিয়া	৩০	৩০	৩০	৩০
এমওপি	২৫			

১২। গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৫০ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখাগুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

১৩। সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত অথবা সকালে যতক্ষণ পযন্ত রোদের তাপ কম থাকে, পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়িগুলো অপসারণ করে এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের কাছাকাছি নিয়ে সংস্পর্শ ছাড়াই পুরুষ ফুলে আস্তে করে টোকা দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হয়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৪-৫টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়। পরাগায়নের পর ফুলটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিলে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।

১৪। চারা/গাছকে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে পুঁড়িয়ে ফেলতে হবে/গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

১৫। ফল পরাগায়ণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে এবং গুণগতমান বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হবে। ফল সংগ্রহের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

১৬। প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২। সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩। কৃত্রিম পরাগায়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুরুষ ফুলের পরাগধানী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পরাগরেণু ভালভাবে গর্ভমুন্ডের উপর পতিত হয়।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ১.২ কুমড়াজাতীয় সবজি ফসলে কৃত্রিম পরাগায়ন করার দক্ষতা অর্জন (লাউ, মিষ্টিকুমড়া, কাঁকরোল ইত্যাদি)



শিখনফল

১. কৃত্রিম পরাগায়নের সংজ্ঞা দিতে পারবে।
২. কোন কোন ধরনের সবজিতে কখন এ ধরনের পরাগায়ন হয় তা বলতে পারবে।
৩. কৃত্রিম পরাগায়নের উপকরণের নাম ওপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও ল্যাব/কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দিতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

কুমড়াজাতীয় ফসলে (Cucurbitaceae পরিবারভুক্ত) পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে ধরে। কাজেই কখনও মৌমাছি বা অন্য কীটপতঙ্গ না আসে তবে ক্ষেতে পরাগায়নের সম্ভাবনা কমে যায়। এমতাবস্থায় পুরুষ ফুল হাতে নিয়ে স্ত্রী ফুলের উপর হালকা করে ছুঁয়ে দিলে ফলধারণ তাড়াতাড়ি হয়। এ প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম

পরাগায়ন বলে। হাত দিয়ে এ ধরনের কাজ সম্পন্ন হয় বলে একে হস্তপরাগায়নও (Hand Pollination) বলা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ভালো জাতের কয়েকটি লাউ গাছ, ২। ধারালো ছুরি, ৩। একটি পুরুষ ফুল, ৪। কয়েকটি স্ত্রী ফুল

কাজের ধারা

১। প্রথমে সিকেচার বা ধারালো ছুরি দিয়ে ফুল ফোটার দিন বিকেলে ভালো জাতের সুস্থ পুরুষ ফুল সংগ্রহ করতে হবে।

২। এরপর পুরুষ ফুলের পাঁপড়িগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে।

৩। অত:পর পুরুষ ফুলের পুংকেশর দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের উপর আস্তে আস্তে ২-৩ বার হালকা করে ঘষা দিতে হবে। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে সাধারণত: ৬-৭টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন করা যায়।

৪। লাউয়ের ফুল ঠিকমতো রোদ পেলে দুপুরের থেকে ফোটা শুরু হয়ে রাত ৭-৮টা পর্যন্ত ফোটে। কৃত্রিম পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত করা যায়। ফুল ফোটার দিন বিকেলে হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন শেষ করে ফেলতে হবে।

৫। মিষ্টিকুমড়া ও কাঁকরোলে একই পদ্ধতিতে পরাগায়ন সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে সকালে স্ত্রী ফুল ফোটার পরপরই পরাগায়ন করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। পুরুষ ফুলের রেণুসহ পরাগধানী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২। স্ত্রী ফুলের উপর যাতে ভালভাবে পরাগরেণু পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। পুংকেশর দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে ঘষা দেওয়ার সময় যেন গর্ভমুন্ডে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

আমার লাউ, মিষ্টিকুমড়া ও কাঁকরোল গাছে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উচ্চ মূল্যের সবজি চাষ

(High Value Vegetable Cultivation)





উচ্চমূল্যের ফসলের উৎপাদন সময়, স্থান, বাজারের চাহিদা, ফলন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। তবে সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জমিতে বোরো ধান চাষ করে যে নিট মুনাফা হয় অন্য ফসল চাষ করে যদি তার চেয়ে বেশী মুনাফা হয় তবে সেই ফসলকে বলা হয় উচ্চমূল্য ফসল। বর্তমানে উচ্চমূল্য ফসল হলো-লেটুস, ক্যাপসিকাম, স্কোয়াশ ইত্যাদি। অতএব যে সব সবজি চাষ করে বাজার হতে অধিক অর্থ পাওয়া যায় তাদেরকে বলা হয় উচ্চ মূল্য সবজি।

এই অধ্যায় শেষে-

- উচ্চ মূল্যের চাষযোগ্য সবজিসমূহের নাম ও পরিচিতি লিখতে পারবে
- ক্যাপসিকাম, লেটুস ও স্কোয়াশ ইত্যাদি সবজিগুলোর বিভিন্ন পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার বলতে পারবে
- উপর্যুক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, জলবায়ু ও মাটি, বিভিন্ন জাত এবং সবজির চাষ মৌসুম ব্যাখ্যা করতে পারবে
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে আধুনিক পদ্ধতিতে উক্ত সবজিগুলোর চাষাবাদ ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- উক্ত ফসলগুলোর উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতিতে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে

২.১ লেটুস (Lettuce)

আমাদের খাদ্যে পাতা জাতীয় সবজি গ্রহণের পরিমান কম। সালাদ হিসাবে বেশি বেশি সবজি কাঁচা খাওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে লেটুস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২.১.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

লেটুসের পরিচিতি ও ব্যবহার: লেটুস সাধারণত পাতা জাতীয় একটি সবজি। লেটুস পাতা মোটামুটি সবারই পরিচিত। সালাদ হিসাবে ব্যবহার্য যত সবজি আছে তার মধ্যে লেটুসের স্থান সবার উপরে। ফাস্টফুড কিংবা রান্নায় এর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লেটুস পাতা কাঁচা অবস্থায় গাজর, টমেটো, বিট, পেঁয়াজ ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে সালাদ তৈরি করে খাওয়া যায়। বার্গার, স্যান্ডউইচ ইত্যাদির সাথে লেটুস পাতা ব্যবহৃত হয়। লেটুস পাতা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও মুখরোচক। তাছাড়া লেটুস শাক হিসাবেও খাওয়া যায়।

ইংরেজি নাম ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম: ইংরেজি নাম Lettuce। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Lactuca sativa*

পুষ্টিমান: সালাদ হিসাবে টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয় বলে লেটুসের পুষ্টিমান নষ্ট হয় না। লেটুস পাতায় ৯৪% পানি, ১.৪% আমিষ, ২.৯% শ্বেতসার, ০.২% স্নেহ থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম লেটুস পাতায় ৩০০-১৫০০ আই.ইউ. ক্যারোটিন, ০.০৯ মিলিগ্রাম থায়ামিন, ০.১২ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ০.৪ মিলিগ্রাম নায়াসিন, ১০ মিলিগ্রাম খাদ্যপ্রাণ, ৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ২.০ মিলিগ্রাম আয়রন রয়েছে। লেটুস পুষ্টি বিবেচনায় একটি উৎকৃষ্ট সবজি। লেটুস পাতা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ (মানব শরীরের অত্যাবশকীয় উপাদান) বিধায় শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

উৎপত্তি: ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়া লেটুসের উৎপত্তি স্থান।

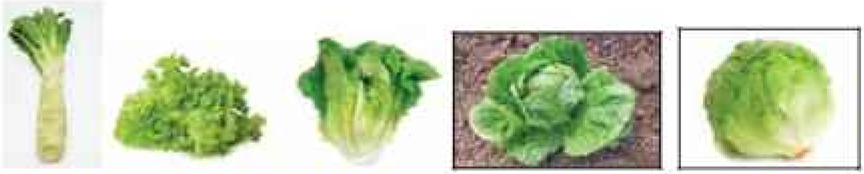
জলবায়ু ও মাটি: লেটুস জন্মানোর পরিবেশগত অবস্থার সীমানা বেশ বিস্তৃত এবং জাত অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। অধিকাংশ জাত ১৫-২০°সেঃ তাপমাত্রায় ভাল জন্মায়। উচ্চ তাপমাত্রায় পাতার সংখ্যা কমে যায় এবং স্বাদে তিক্ত হয়। সুনিষ্কাশিত জৈব পদাথ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি লেটুস চাষের জন্য উপযোগী। নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ মাটিতে লেটুস ভালো হয়। লেটুস চাষের জন্য মাটির অনুকূল পিএইচ হলো ৫.৮ থেকে ৬.৬।

উৎপাদন মৌসুম: আমাদের দেশে কেবল রবি মৌসুমে, বিশেষ করে নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে লেটুস চাষ করার উপযুক্ত সময়।

লেটুসের জাত পরিচিতি

লেটুসের পাতার গঠন ও বিন্যাসের বিভিন্নতার ভিত্তিতে লেটুস জাতগুলোকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১. **হেড লেটুস:** এই শ্রেণির লেটুস বাঁধাকপির মতো মাথা বাধে।



চিত্র: স্টেম লেটুস, ঢিলে পাতা লেটুস, রোমেন লেটুস, হেড লেটুস

২. **রোমেন লেটুস:** এই জাতীয় লেটুস ঢিলেঢালা মাথা গঠন করে।

৩. **ঢিলে পাতা লেটুস:** এ লেটুস কোন মাথা গঠন করে না। পাতা সমতল বা কোঁচকানো এবং রোজেট আকারে সাজানো থাকে। সালাদের জন্য এই জাত চাষ করা হয়।

৪. **স্টেম লেটুস:** এ জাতীয় লেটুস মাথা গঠন করে না। এই জাতের লেটুসের কান্ড টাটকা ও সিদ্ধ করে খাওয়া যায়।

বাংলাদেশে লেটুসের জাত: বাংলাদেশে বর্তমানে সীমিত আকারে লেটুস চাষ হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে "বারি লেটুস-১" নামে প্রথম লেটুসের জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জাতটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ উপযোগী।

বারি লেটুস-১ জাতের বৈশিষ্ট:

১. রবি মৌসুমে চাষ করা যায়।

২. জীবনকাল ৪০-৫০ দিন।

৩. ঢিলে পাতা শ্রেণীভুক্ত এই জাতটির পাতা গাঢ় সবুজ।

৪. ৫০ দিনে জাতটি প্রতি গাছের ফলন ৩৫০-৪০০ গ্রাম এবং প্রতি শতকে ফলন ৬০-৬৫ কেজি।

৫. স্থানীয় আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে বীজ উৎপাদন করতে পারে।

বীজ বপন সময়: বাংলাদেশে কেবল রবি মৌসুমে, বিশেষ করে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত লেটুস চাষের উপযুক্ত সময়।

বীজ হার: চারা তৈরি করার জন্য বীজ হার ১ গ্রাম/শতক (১১০ গ্রাম/একর)।

বীজ সরাসরি বপন পদ্ধতির হার ৪-৫ গ্রাম/শতক (৪০০-৫০০ গ্রাম/একর)।

বীজ শোধন: বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ সবল চারা উৎপাদনের জন্য ভিটাভ্যাক্স/প্রোভ্যাক্স জাতীয় ছত্রাকনাশক

২.৫০ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

বীজ ভিজানো: লেটুসের বীজ আলোক সংবেদনশীল। এর বীজ ফটোব্লাষ্টিক (Photoblastic)। মাঠে লেটুসের বীজর অংকুরোদগম হার অনেক সময় কম হয়। ১০ পিপিএম GA_3 দ্রবনে বীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে বপন করলে কাঙ্খিত অংকুরোদগম হার পাওয়া যায়।

বপন সময় ও পদ্ধতি

১. সরাসরি বীজ বপন বা চারা রোপণ করে লেটুসের চাষ করা যায়।

২. বীজ বপনের ক্ষেত্রে জাতভেদে ৪০-৫০ সেমি দূরত্বে সারি করে একটু ঘনভাবে বীজ বপন করতে হয়। চারা গজানোর পর ২৫-৩০ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে চারা পাতলা করে দিতে হবে।

৩. চারা রোপণের ক্ষেত্রে বীজতলায় বীজ বপন করে চারা রোপণ করতে হয়। এ পদ্ধতিতে বীজতলায় ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে।

৪. চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে চারা মূল জমিতে ৪০ থেকে ৪৫ সেমি. দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

২.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে এমন স্থানই লেটুস চাষের জন্য উপযুক্ত।

মাটি নির্বাচন: সুনিস্কাশিত দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

প্রাথমিকভাবে জমি প্রস্তুতকরণ: জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ: প্রাথমিক ভাবে জমি তৈরী ও প্রয়োজনীয় সার মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার পর মূল জমিতে ৪০ থেকে ৪৫ সেমি. দূরত্বে সারি থেকে সারি করে প্রতি সারিতে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ: ভাল ফলনের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করা উচিত। লেটুসের জমিতে জৈব ও রাসায়নিক উভয় সার প্রয়োগ করতে হবে। লেটুস চাষের জন্য শতাংশ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলোঃ

সার	মোট পরিমাণ/শতক	শেষ চাষের সময়	চারা রোপণের ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩৫ দিন পর
১. গোবর/জৈব সার	২০-২৮ কেজি	২০-২৮ কেজি	-	-	-
২. ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	-	৩০০ কেজি	২৫০ কেজি	২৫০ কেজি
৩. টিএসপি	৩০০ গ্রাম	৩০ কেজি	-	-	-
৪. এমওপি	৩০০ গ্রাম	৩০ কেজি	-	-	-

স্বল্প মেয়াদি ফসল বিধায় সকল সার ফসল রোপণ করার পূর্বে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে পরিস্থিতি ভেদে ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২.১.৩ লেটুসের বীজ বপন/ চারা রোপণ

লেটুস চাষে বীজ সরাসরি জমিতে বপন করা যায়। আবার বীজতলায় বীজ বপন করে চারা তৈরি করে তারপর জমিতে চারা রোপণ করা যায়। চারার বয়স সাধারনত এক মাস হলে জমিতে রোপণ করা যায়। লাইন অনুযায়ী চারা রোপণ করতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৪০-৪৫ সেমি। চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ২৫-৩০ সেমি। লেটুসের বীজ আকারে খুব ছোট তাই বীজ বপন করার সময় বীজের সাথে ছাই মিশিয়ে নেওয়া উচিত। চারা রোপণ করতে হবে বিকেল বেলা । চারা রোপণ করার সময় সাবধানে রোপণ করতে হবে যেন চারার শিকড় আঘাত না পায়। রোপণ করার পর চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে হালকা ভাবে চেপে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর চারাকে রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ৩-৪ দিন ঢাকনি দিয়ে ঢেকে

রাখতে হবে। সকাল বিকাল নিয়মিত পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে জমিতে সেচ দিতে হবে এবং মাঝে মাঝে চারার গোড়ার মাটি নিড়ানি দিয়ে হালকা আলগা করে দিতে হবে।

৭.১.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা দমন: লেটুসের জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। কারণ আগাছা পোকার আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করে এবং ফসলের খাদ্য-পুষ্টিতে ব্যাহত করে। আমাদের দেশে মুথা, ভাদাইল, শ্যামা, বথুয়া, চাপড়াঘাস, নুনে ও দুর্বা ইত্যাদি আগাছা লেটুস ক্ষেতে সচারচর দেখা যায়। এসব আগাছা দমনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়ঃ

ক) আগাছার বীজমুক্ত লেটুসের বীজ ব্যবহার করা।
খ) উত্তমরূপে ভূমিকর্ষন করা।
গ) নালা পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করা।
ঘ) শস্য পর্যায় পদ্ধতি অনুসরণ করা।
ঙ) নিড়ানি দেওয়া বা কোপানোর ব্যবস্থা করা।

সারের উপরি প্রয়োগ: ইউরিয়া সার প্রয়োজনে জমি তৈরির সময় না দিয়ে ৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথম কিস্তিতে বীজ বপনের ১৫দিন পর ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, দ্বিতীয় কিস্তিতে বীজ বপনের ২৫ দিন পর ২৫০ গ্রাম এবং তৃতীয় কিস্তিতে অবশিষ্ট ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খুটি দেওয়া: সাধারণত লেটুসের জন্য খুটি ও মাচা দরকার পড়ে না। কিন্তু বীজ উৎপাদনের সময় খুটির প্রয়োজন হয়।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা: লেটুস চাষে সেচ অপরিসীম। শুষ্ক আবহাওয়া ৫-৬ দিন পর পর নিয়মিত সেচ দিতে হবে। তবে উচ্চ পর্যায়ের নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেচ পরবর্তী জমিতে 'জো আসলে লেটুসের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

মালচিং বা জাবরা প্রয়োগ: খড়, কচুরীপানা, আখের ছোবড়া, করাতের গুড়া, পুরানো পত্রিকার কাগজ ইত্যাদি জৈব পদার্থ বা কালো প্লাস্টিক ব্যবহার করে মালচিং করা যায়। এতে মাটির রস সংরক্ষিত হয়, মাটি ক্ষয় রোধ এবং আগাছা দমন হয়।

চারা পাতলাকরণ: সরাসরি বীজ বুনে চারা গজানোর পরে দফায় দফায় সেগুলো পাতলা করে দিতে হয় যাতে শেষ পর্যন্ত পাশাপাশি দুটি গাছের মধ্যে ২৫-৩০ সেমি ব্যবধান থাকে। চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর চারিদিকে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন: লেটুসের বিভিন্ন পোকার আক্রমন হতে পারে।

ক) ফ্লি বিটল: লেটুসের ক্ষতিকর পোকার নাম হলো ফ্লি বিটল। পূর্ণ বয়স্ক ও বাচ্চা উভয়ই ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে।

লক্ষণ: এই পোকা পাতায় ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়। আক্রান্ত পাতায় অসংখ্য ছিদ্র হয়।


চিত্র: ফ্লি বিটল আক্রান্ত লেটুস পাতা


চিত্র: পূর্ণ বয়স্ক ফ্লি বিটল

প্রতিকার

১) হাতজাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ করতে হবে।

২) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৪) আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫) ০.৫% ঘনত্বের সাবান পানি অথবা ৫ মিলি তরল সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

৬) ৫০০ গ্রাম নিম বীজের শাঁস পিষে ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তা ছেঁকে আক্রান্ত ক্ষেতে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

খ) জাব পোকা: লেটুস পাতার ক্ষতিকর অপর একটি পোকার নাম হলো জাব পোকা।

লক্ষণঃ এ পোকা গাছের পাতার রস চুষে খেয়ে ফেলে। এছাড়াও পোকার মলদ্বার থেকে এক ধরণের তরণ পদার্থ বের হয়, যা 'সুটি মোল্ড' নামে এক প্রকার কালো বর্ণের ছত্রাক সৃষ্টি করে। ফলে আক্রান্ত অংশের সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

দমন ব্যবস্থা: এ পোকা দমন করা খুবই জরুরী। তবে পোকার সংখ্যা কম হলে হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা উত্তম। আক্রমণ মাত্রা বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ওষুধ ছিটানোর ১৫ দিনের মধ্য সবজি খাওয়া উচিত নয়। এজন্য আইপিএম পদ্ধতি অনুসরণ করে পোকা দমন করাই উত্তম।

রোগবালাই:

ক) ছাতা রোগ: লেটুসের পাতায় কখনো কখনো 'ছাতা' রোগ দেখা দিতে পারে। এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ।

লক্ষণ: এ রোগের লক্ষণ হচ্ছে-গাছের পাতা নুইয়ে পড়া এবং পাতার অগ্রভাগ পুড়ে যাওয়া।

দমন ব্যবস্থা:

১. আক্রান্ত গাছ অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

২. বীজ ও মাটি শোধন করতে হবে।

৩. শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।

খ) গোড়াপচা রোগ: জমি স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে গোড়াপচা রোগের আক্রমণ হতে পারে। এটিও একটি ছত্রাক জাতীয় রোগ।

দমন ব্যবস্থা:

১. প্রয়োজনীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

২. অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলে পরিপক্কতা নির্ধারণ: হেড টাইপ জাতসমূহ ভালভাবে মাথা বাঁধার পর সংগ্রহ করতে হবে। ঢিলে পাতা জাতসমূহ একবারে অথবা নিচের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহকরণ: লেটুস ফসল সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট সময় নেই। পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে লেটুস সংগ্রহ করতে হবে।

ফসল সংরক্ষণ: লেটুস পচনশীল বলে সংগ্রহের পর দ্রুত বাজারজাতকরণ করতে হবে।

ফলন: উন্নত চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করলে জাত অনুযায়ী ফলন প্রতি শতকে ৮০ থেকে ১০০ কেজি।

২.২ ক্যাপসিকাম (Capsicum)

ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ সারা বিশ্বেই একটি জনপ্রিয় সবজি। বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে বড় বড় শহরের আশেপাশে সীমিত পরিসরে কৃষকরা এর চাষ করে থাকেন, যা অভিজাত হোটেলে ও বিভিন্ন বড় বড় মার্কেটে বিক্রি হয়ে থাকে। তাছাড়া বিদেশে রপ্তানীর সম্ভাবনাও প্রচুর। কারণ সারা বিশ্বেই টমেটোর পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সবজি হচ্ছে ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ।

২.২.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

ক্যাপসিকামের পরিচিতি ও ব্যবহার: মিষ্টি মরিচ সবার কাছে ক্যাপসিকাম নামে পরিচিত। স্বাদে ঝাল কম বলে একে মিষ্টি মরিচ বলে। সালাদের জন্য এই মরিচ খুবই উপযুক্ত। লম্বা ও মোটা আকৃতির এই মরিচ দেখতে অনেকটা ঘন্টাকৃতি। বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা ও চাষ দুটোই বাড়ছে। পুষ্টিমানের দিক থেকে ক্যাপসিকাম একটি মূল্যবান সবজি। কাঁচা ও রান্না উভয় অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। কাঁচা ক্যাপসিকাম কুচি কুচি করে সালাদের সাথে খাওয়া যায়। মিশ্রসবজি হিসাবে অন্য সবজির সাথে রান্না করে খাওয়া যায়। তাছাড়াও ভাজা, পাকোড়া, চচ্চড়ি, চপ, আচার ইত্যাদি তৈরিতেও ক্যাপসিকাম ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: নুডুলসের সাথে



চিত্র: ক্যাপসিকামের আচার



চিত্র: সবজির সাথে



চিত্রঃ মাংসের সাথে

বৈজ্ঞানিক নাম: *Capsicum annuum.*

পুষ্টিমান: ক্যাপসিকামের পুষ্টিমান অনেক। প্রতি ১০০ গ্রাম ক্যাপসিকামে ভিটামিন “এ” ৮৭০ আন্তর্জাতিক একক, ভিটামিন “সি” ৩২১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন “বি” ২.১ মিলিগ্রাম, ফলিক এসিড ১.৩-২.৯ মিলিগ্রাম,

নিকোটিনিক এসিড ৬-১০ মিলিগ্রাম, প্রোটিন ১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৫৫ মিলিগ্রাম ও পানি ৯২.৪ গ্রাম।

উৎপত্তি: ক্যাপসিকাম এর উৎপত্তি স্থল হলো লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল।

জলবায়ু ও মাটি: মানসম্মত ক্যাপসিকাম উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬-২১° সে. এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ঝড়ে পড়ে,ফলন ও মান কমে যায় , কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয় না। ক্যাপসিকাম বাংলাদেশে সবজি চাষের এলাকায় চাষাবাদের উপযুক্ত। সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উত্তম। মাটির অনুকুল পিএইচ হলো ৫.৫ থেকে ৬.৬।



চিত্রঃ মাঠে ক্যাপসিকাম চাষ

উৎপাদন মৌসুম: আমাদের দেশে শীত মৌসুমে ক্যাপসিকাম চাষ হয়।

জাত পরিচিতি: সাধারণত আমাদের দেশে আবাদকৃত জাতগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে- ক্যালিফোর্নিয়া ওয়ান্ডার,ওয়ান্ডার বেল, ইয়োলো ওয়ান্ডার ইত্যাদি। প্রতি বৎসর এই জাতগুলোর বীজ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তাছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক ক্যাপসিকামের ২টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জাত ২টি বাংলাদেশের সব অঞ্চলে চাষ উপযোগী।

বারি মিষ্টি মরিচ-১ জাতের বৈশিষ্ট

১. প্রতি গাছে ৭-৯ টি ফল পাওয়া যায়।

২. গড় ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম।

৩. উজ্জ্বল সবুজ বেল আকৃতির ফল পাকলে লাল রঙের হয়।

বারি মিষ্টি মরিচ-২ জাতের বৈশিষ্ট

১. এই জাতটির গড় ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম।

২. চকচকে সবুজফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

৩. গাছ প্রতি ১২-১৩ টি ফল পাওয়া যায়।

বপন সময়: বীজ বপনের সময় সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর। তবে বীজ বপনের উত্তম সময় হচ্ছে অক্টোবর মাস।

বীজ শোধন: বীজ বপনের আগে ভিটাভ্যাক্স বা থাইরাম জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

বীজ হার: ১.৫-২.০ গ্রাম/শতক।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: চারা নার্সারীতে পলিব্যাগে উৎপাদন করাই উত্তম। বপনের পূর্বে বীজগুলো ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুনিস্কাশিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০×২ সেমি দুরে দুরে বীজ বপন করে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনানুসারে ঝাঝরি দিয়ে হালকা ভাবে পানি সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৪-৭ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে ৯×১২ সেমি আকারের বড় পলি ব্যাগে চারা স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩:১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোষ্ট এবং বালু মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে প্রখর সূর্যালোকে এবং ঝড় বৃষ্টি আঘাত হানতে না পারে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

১. শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাষ্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে দিতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

২. প্রয়োজন অনুসারে ঝাঝরি দিয়ে চারায় পানি দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন চারায় সরাসরি পানি না পড়ে।

৩. পলিব্যাগের ভিতর মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

৪. চারায় কোন পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. পলিব্যাগের চারার বয়স ৩০ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

২.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: উর্বর দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশমাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: জমি ৪-৫ বার গভীর চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে যাতে জমিতে বড় বড় মাটির ঢেলা এবং আগাছা না থাকে। চারা রোপণ দূরত্ব জাত ভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণত ৩০ দিন বয়সের চারা ৪৫×৪৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হয়। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বেড প্রস্থে ৭৫ সেমি হতে হবে এবং লম্বায় দুই সারিতে ২০টি চারা সংকুলনের জন্য ৯ মিটার বেড হবে। দুই সারির মাঝখানে ৩০ সেমি নালা করতে হবে। চারা বিকাল বেলায় রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ক্যাপসিকাম চাষে প্রতি শতকে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময়	পিটে বা গর্তে	উপরি প্রয়োগ	
				চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	৪০ কেজি	২০ কেজি	২০ কেজি	-	-
ইউরিয়া	১.০০ কেজি	-	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম

২০২৫

টিএসপি	১.৫০ কেজি	১.৫০ কেজি	-	-	-
এমপি	১.০০ কেজি	-	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম
জিপসাম	০.৫০ কেজি	০.৫০ কেজি	-	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	২০.০০ গ্রাম	২০.০০ গ্রাম	-	-	-

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, সম্পূন্ন টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক অক্সাইড শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার, ১/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং ১/৩ ভাগ এমপি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিস্ট ইউরিয়া এবং এমপি পরবর্তীতে দুই ভাগ করে চারা লাগানোর ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

২.২.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): চারা লাগানোর ৭-১০ দিনের মধ্যে যে সমস্ত চারা মারা যায়, সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা দমনঃ আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। তাই চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।

খুটি দেওয়া: কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভাড়ে হেলে না পড়ে।

উপরি সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গর্ত প্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ দেওয়া: জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের পরপরই প্রথমবার সেচদিতে হবে। ক্যাপসিকাম খরা কিংবা জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারে না। শুষ্ক মৌসুমে সাধারণত ১২-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হয় এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচিং দেওয়া: প্রতিবার সেচের পর হালকা মালচ করে গাছের গোড়ায় মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

পলিথিন ছাউনি: নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাত্রের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। এ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কাজেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভেতরের তাপমাত্রা বাহিরের অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

(ক) ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

নানারকম পোকার আক্রমণে ক্যাপসিকাম এর ফলন কম হয়। যেমন:

১) থ্রিপস (Thrips) পোকা

লক্ষণ

১. ছোট ছোট পোকা, পাতার নিচে থাকে এবং পাতার রস শুষে খায়।

২. আক্রান্ত পাতা কুঁচকে যায়।

২০২৫

দমন ব্যবস্থা

১. সাদা আঠালো বোর্ড পেপার ব্যবহার করতে হবে।

২. পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অ্যাসিফেট ১মিলি. প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাতার নিচের দিকে ওষুধ লাগে।

২) জাবপোকা (Aphids)

লক্ষণ

১. অতিক্ষুদ্র, হালকা ও ঘন সবুজ, হলুদাভ ও কালচে রং এর পোকাগুলি গাছের পাতা, ডগা, ফুল ও কচিফলের রস শুষে খায়।

২. এই পোকা বাহক হিসাবে ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থা

১. হলুদ ফাঁদ: ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় টাংগিয়ে দেওয়া হয় পোকা সেখানে এসে পড়ে এবং আঠাতে আঁটকে যায়।

২. ইমিডাক্লোপ্রিড বা কার্বোসালফান জাতীয় কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৭ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করে জাবপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩) মাকড় (Mites)

লক্ষণ

১. লাল এবং হলুদ রং এর বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক মাকড় ফসলের ক্ষতি করে। খুব ছোট পোকা, সহজে নজরে আসে না, পাতার নীচে জালিকা তৈরি করে তার ভিতর বাসা বাঁধে এবং পাতার রস খায়।

২. আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় এবং ধূসর হলুদ এবং ক্রমে বর্ণহীন হয়ে যায়।



চিত্র: মাকড় আক্রান্ত ক্যাপসিকাম



চিত্র: মাকড় আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থা:

১. গাছে ফুল ধরার আগে ডাইকোফল জাতীয় কীটনাশক ১.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে এবং ফুল ধরার পরে ইথিয়ন ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪) পাতার ত্বক ভেদকারী পোকা (Leaf Minor)

লক্ষণ

১. শূককীট পাতার উপরের স্তর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে ও রস খায়।

২. পাতার উপরে আঁকাবাঁকা সাদাটে দাগের আলপনা আকৃতি দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

১. প্রোফেনোফস কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিশেষ পরিচর্যা: অন্যান্য সবজির মতোই ক্যাপসিকাম গাছেও রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করার আগে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। ওষুধের বিষক্রিয়ার তীব্রতা, স্থায়িত্ব, মাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জেনে সময় মতো স্প্রে করা উচিৎ। ফসল তোলার ১৫দিন আগে থেকে যেকোন রকম ওষুধই স্প্রে করা উচিৎ নয়। বর্তমানে বাজারে নানারকম জৈব কীটনাশক বেরিয়েছে। এগুলির ব্যবহার মোটামুটি নিরাপদ। যেমন, নিমতেল (১%) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি. হারে স্প্রে করে অধিকাংশ পোকা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এ ছাড়া, তামাক পাতার নির্যাস ও সাবান জলের মিশ্রণ স্প্রে করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

খ) রোগবালাই দমন: নানারকম রোগ ব্যাধির আক্রমণে ক্যাপসিকাম এর ফলন কম হয় এবং অনেক সময় ক্ষেত উজাড় করে চাষী ভাইকে পথে বসায়। এগুলির কিছু ছত্রাক ঘটিত, কিছু ব্যাকটেরিয়া ঘটিত এবং কিছু ভাইরাস ঘটিত।

১) চারা ঢলে পড়া রোগ (Damping Off): ছত্রাক জনিত একটি রোগ।

লক্ষণ

১) বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর মাটির নিচে অথবা মাটির উপরে চারা বের হবার পর হঠাৎ ঢলে পড়ে এবং চারার গোড়ার অংশ জলবসা দাগ হয়ে পচে যায়। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এবং মেঘলা পরিবেশে এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়।



চিত্র: চারা ঢলে পড়া রোগ (Damping Off)

দমন ব্যবস্থা

১. বীজ বপনের আগে শোধন করে নেওয়া উচিৎ। প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ক্যাপটান বা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে বীজ শোধন করা যেতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব

বা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড মিশিয়ে বীজতলা ভালো করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, ম্যানকোজেব জাতীয় ওষুধ ৭ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার বীজতলায় স্প্রে করতে হবে।

২) এ্যানথ্রাকনোজ রোগ (Anthracnose)

লক্ষণ

১. চারা অবস্থায় পাতার ছোট ছোট কালো দাগ দেখা যায় এবং কচি ডগা ধীরে ধীরে শুকাতে থাকে। উপরের দিকের পাতা ঝরে যায় এবং শুকনা, পাতাহীন গাছ দাঁড়িয়ে থাকে; ফুল ও ফল ঝরে যায়। ফলে, গাছের ফলন কমে যায়।

২. কচি অবস্থায় আক্রান্ত ফল ঝরে যায় এবং বড় ফলের গায়ে ফোস্কার মতো দাগ ধরে ও পচে যায়।

৩. এটি মূলত বীজবাহিত রোগ। তাই বীজশোধন ও বীজতলা শোধন করে এই রোগ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ক্যাপসিকাম চাষের প্রধান সমস্যাই হল এই রোগ। তাই প্রথম থেকেই এই রোগ দমনে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ।



চিত্র: ডগা শুকিয়ে যাওয়া ও ফলপচা রোগ

দমন ব্যবস্থা

১. রোগাক্রান্ত জমিতে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম অথবা ম্যানকোজেব জাতীয় ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর নিয়মিত স্প্রে করতে হবে।

৩) ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত দাগ (Bacterial Spot)

লক্ষণ

১. পাতায় ও ফলে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পাতার নীচের দিকে প্রথমে গোলগোল জলবসা দাগ দেখা যায়। পরে দাগের রং হয় ধূসর বাদামী এবং মাঝে থাকে লালচে ছিট ছিট দাগ। ক্রমে ঐ অংশ পচে যায় ও উপরের দিকে ফুলে ওঠে।

২. ক্রমশ ঐ দাগ বড় হতে থাকে এবং পুরো পাতাই নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় পাতার বোঁটা এবং গাছের সরু ডগাও আক্রান্ত হয়। সবুজ ফল এর গায়ে কালচে রং-এর উঁচু উঁচু দাগ দেখা যায়।

৩. রোপণের ৪৫-৬০ দিনের মাথায় এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা

১. বীজবাহিত রোগটির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বীজশোধন করা অত্যন্ত জরুরী।

২. এছাড়া নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ, বীজতলা শোধন এবং আক্রান্ত গাছে বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে।

৪) পাতা কোঁকড়ানো রোগ (Leaf curl)

লক্ষণ

১. এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগাক্রান্ত গাছের পাতা কুঁকড়ে যায়, ছোট হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধরে না। এই রোগ ছড়ায় এক ধরনের সাদা মাছি (বাহক)।

দমন ব্যবস্থা

১. সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফারমাথিওন ২ মিলি. প্রতি লিটার পানিতে বা অসিফেট ১মিলি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে পাতার উপরে ও নিচে। ফসল তোলার অন্ততঃ ১৫-২০ দিন আগে কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করা উচিৎ।

২.২.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: ক্যাপসিকাম যেহেতু কাঁচাই খাওয়া যায় তাই পুরোপুরি বড় আকারের হলে বাকলের সবুজ রং থাকতেই ফল তোলে ফেলতে হবে। না হলে বাজারে বিক্রি করা যাবে না। আঙ্গুল দিয়ে টিপ দিয়ে দেখতে হবে যদি নরম মনে হয় তবে যেসব ক্যাপসিকাম আরও কিছু দিন গাছে বড় হওয়ার জন্য রাখতে হবে। পূর্ণ পরিণত হলে সেই সমস্ত ক্যাপসিকামের খোসা একটু শক্ত ও মচমচে মনে হবে। ফল তোললেই সেইসব গাছে ২-৩ দফায় ক্যাপসিকাম ধরবে এবং ফলনও বাড়বে।

ফসল সংগ্রহ: ফল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ক্যাপসিকাম সামান্য পরিমাণে বোটা রেখে দিতে হবে। সাধারণত পরিপক্ক সবুজ অবস্থায় লালচে হওয়ার আগেই মাঠ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হয়।

সংরক্ষণ: ক্যাপসিকাম বড় ও রসালো বেশি। এজন্য বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম বা শুষ্ক দিনে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করার পর কুঁচকানো শুরু হয়। পাতলা ভেজা সুতি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিলে কুঁচকানো সমস্যা হয় না। ২-৪ দিন পর বিক্রি করলেও সতেজ থাকে।

ফলন: প্রতি শতাংশে ২০০-২২০ কেজি।

২.৩ স্কোয়াশ (Squash)

আজ আমরা একটি নতুন সবজি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি। এ সবজির নাম হলো স্কোয়াশ। কোন পানীয় নয়, এটি মূলত একটি কুমড়া জাতীয় শীতকালীন সবজি। অনেক দিন ধরেই এটি উচ্চমূল্য সবজি হিসাবে চাষ হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে স্কোয়াশ চাষ অন্য যে কোন ফসলের চেয়ে বেশি লাভজনক। প্রতি বিঘা জমিতে স্কোয়াশ চাষে খরচ হয় ৯-১০ হাজার টাকা। কিন্তু ১ বিঘা জমি থেকে মুনাফা হয় ৬০-৭০ হাজার টাকা। বিভিন্ন সুপারশপ ও চীনা রেস্তোরাঁয় এর চাহিদা ব্যাপক।

২.৩.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

স্কোয়াশের পরিচিতি ও ব্যবহার: স্কোয়াশ কুমড়া পরিবারের একটি লতানো প্রকৃতির একবর্ষজীবী গুল্ম স্বভাবের গাছ। স্কোয়াশ ভিটামিন "এ" সমৃদ্ধ সবজি। এর পাতা এবং কান্ড সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সামার স্কোয়াশ চিংড়ি এবং ডিমের সাথে তরকারি ও শুধু ভাজি হিসাবে খাওয়া যায়।


চিত্র: আলুর সাথে স্কোয়াশ


চিত্র: চিংড়ীর সাথে স্কোয়াশ


চিত্র: আলুর ও চিংড়ীর সাথে স্কোয়াশ


চিত্র: ডিমের সাথে স্কোয়াশ

বৈজ্ঞানিক নাম: *Cucurbita pepo.*

পুষ্টিমান: স্কোয়াশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' রয়েছে। ১০০ গ্রাম স্কোয়াশে শক্তি ১৬ ক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ৩.৪ গ্রাম, প্রোটিন ১.২ গ্রাম, ফাইবার ১.১ গ্রাম এবং সুগার রয়েছে ১.৭ গ্রাম।

উৎপত্তি: স্কোয়াশের এর উৎপত্তি স্থল ইউরোপের দেশ ইতালী।

জলবায়ু ও মাটি: স্কোয়াশের জন্য উষ্ণ, প্রচুর সূর্যালোক এবং নিম্ন আর্দ্রতা উত্তম। ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হলো স্কোয়াশের চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ বা এঁটেল দো-আঁশ মাটি এর চাষাবাদের জন্য উত্তম, তবে চরাঞ্চলে পলিমাটিতেও স্কোয়াশ ভালো ফলন দেয়।

উৎপাদন মৌসুম: শীতকালে চাষের জন্য অক্টোবর -ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়।

জাত পরিচিতি: "বারি স্কোয়াশ-১" জাতটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত।

বৈশিষ্ট্য: এ জাতের বৈশিষ্ট্য:

১. পরাগায়নের পর থেকে মাত্র ১৫-১৬ দিনেই ফল সংগ্রহ করা যায়।
২. নলাকার গাঢ় সবুজ বর্ণের ফল।
৩. ফলের গড় ওজন ১.০৫ কেজি।
৪. এ জাতের জীবনকাল ৮০-৯০ দিন।
৫. প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ৪৫-৫০ টন।

বীজ বপনে সময়

শীতকালীন : আগস্ট - অক্টোবর
গ্রীষ্মকালীন : ফেব্রুয়ারি - মে

বীজ শোধন: স্কোয়াশের বীজ বপন করার আগে সেই বীজ ১২-২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। মাটি থেকে ছড়িয়ে পড়া ছত্রাক থেকে বীজকে বাঁচাতে হলে, বীজ বপনের আগে কার্বেন্ডাজিম বা থিরাম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে ছত্রাক ঘটিত রোগের আক্রমণ কমে যায়।

বীজ হার: শতক প্রতি ১০ গ্রাম বীজ লাগে (১কেজি/একর)।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

শীতকালে চাষের জন্য অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করা যায়। চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভালো হয়। বীজ বপনের জন্য ৮-১০ সেমি. বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগে ভরতে হবে। দ্রুত অঙ্কুরোদগমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) দ্রবণে বীজ এক রাত ভিজিয়ে অতঃপর পলিব্যাগে বপন করতে হবে। প্রতি ব্যাগে দুটি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে। বীজ সরাসরি মাদায়ও বপন করা হয়। সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করা যেতে পারে। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর ১টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। পলিব্যাগে চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

বেড তৈরি

বেডের উচ্চতা ১৫-২০ সেমি. ও প্রস্থ ১-১.২৫ মি. এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধা মতো করতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৭০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি

মাদার ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি. গভীরতা ৫০-৫৫ সেমি. এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি. প্রশস্ত হবে। ৬০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি. বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে চারা লাগাতে হবে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

১. শীতকালের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাত্রে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

২. পলিব্যাগে চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর মাত্র ১টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৩. চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

৪. স্কোয়াশের চারাগাছে "রেড পামকিন বিটল" নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

২.৩.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ:

জমি নির্বাচন: স্কোয়াশ চাষ করতে মাটিকে উত্তমরূপে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

মাটি নির্বাচন: বেলে দো-আঁশ মাটি এবং দো-আঁশ মাটি স্কোয়াশ চাষের পক্ষে উপযুক্ত। স্কোয়াশ চাষের জন্য মাটির উপযোগী অম্লতা হলো ৫.৫-৬.৫ ।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: ভালো ফলন পেতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। মাটি ও জমির প্রকারভেদে ৫-৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। শীতকালীন চাষের সময় জমিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে প্রয়োজনে জমি চাষের আগে সেচ দিয়ে নিতে হবে। স্কোয়াশ চাষ করতে গেলে ১৫ সেন্টিমিটার গভীরতা এবং ২ মিটার দূরত্ব রেখে জমিটি প্রস্তুত করা উচিত।




চিত্র: জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: মাটির অবস্থা বুঝে সারের পরিমাণ কম/বেশিও হতে পারে। স্কোয়াশ চাষে প্রতি শতকে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হলো:

সারের নাম	মোট পরিমাণ	জমি তৈরির সময়	উপরি প্রয়োগ		
			চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে মাদা প্রতি	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর মাদা প্রতি (প্রতি শতকে সকল মাদায়)	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর মাদা প্রতি (প্রতি শতকে সকল মাদায়)
গোবর	৮০ কেজি	৮০ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	৭০০ গ্রাম	-	-	৩৫০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
টিএসপি	৭০০ গ্রাম	৭০০ গ্রাম	-	-	-
এমওপি	৬০০ গ্রাম	৪৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
জিপসাম	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-		
দস্তা	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-		

২.৩.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

পলিব্যাগে উৎপাদিত চারার বয়স ১৫-১৬ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের আগের দিন বিকেলে পানি দিয়ে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হয়। মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ওলট-পালট করে, এককোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হয়। অতঃপর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশের মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে। চারা লাগানোর পর মাদায় পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর এবং চারা রোপণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং মাটির দলা না ভাঙ্গে।

২.৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): চারা রোপণের ৮-১০ দিনের মধ্যে যে সব চারা মারা যায়, সে সব মাদায় নতুন চারা রোপণ করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

আগাছা দমন: জমিতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবে না। আগাছা জন্মালে তা নিড়ানির সাহায্যে তুলে ফেলতে হবে। ভাঁটফুল আগাছা স্কোয়াশের রেড পামকিন বিটলের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার হয়। হাতিশুঁড় ও পানি লং আগাছা স্কোয়াশের মোজাইক রোগের বিকল্প পোষক। তাছাড়াও আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। তাই চারা রোপণের পর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

কৃত্রিম পরাগায়ন: কৃত্রিম পরাগায়নে পুরুষ ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলের উপর ছড়িয়ে দিলে উৎপাদন বাড়বে।

শোষক শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা বের হয়। এগুলোকে শোষক শাখা বলে। শোষক শাখা গাছের বৃদ্ধিতে বাধা দেয় ও ফলন কমিয়ে দেয়। তাই এইগুলোকে ভেঙ্গে দিতে হবে ।

উপরি সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদাপ্রতি সারের উপরি প্রয়োগ গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন পদ্ধতি: সার দেওয়ার পর হালকা সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। স্কোয়াশ গাছ সপ্তাহে ২ ইঞ্চি পানি শোষণ করে থাকে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করতে হবে। শীতকালীন চাষের জন্য এক মাস পর পর জমিতে সেচ দিতে হবে। স্কোয়াশ চাষের সময় জমিতে পানি বেশি সময় জমতে দেওয়া যাবে না।

মালচিং: স্কোয়াশ চাষে মালচিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। চারা ভালভাবে টিকে গেলেই গোড়ার চারপাশে মালচিং করলে তাপমাত্রা ঠিক থাকে এবং মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখে। বিষয়টি স্কোয়াশের ফলনও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

পলিথিন ছাউনি: সাধারণত স্কোয়াশ উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫ ডিগ্রি সে.তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাত্রে তাপমাত্রা ১৭-২১ ডিগ্রি সে. এর কম বা বেশি হলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে ও ফলন কমে যায়। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভেম্বরে চারা লাগালে দেখা যায় যে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাত্রের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, ফলে এ সময় গাছের

দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এইজন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভেতরের তাপমাত্রা বাহিরের অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

(ক) ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন

নানারকম পোকার আক্রমণে স্কোয়াশের ফলন কম হয়। যেমনঃ

১) ফলের মাছি পোকা (Fruit Fly)

মাছি পোকা সাধারণত স্কোয়াশের কচি ফলে বেশি আক্রমণ করে।

ক্ষতির ধরণ: স্ত্রী মাছি তার লম্বা সরু ডিম পাড়ার নলের সাহয্যে কচি ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে লাভা/কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেয়ে বড় হতে থাকে, আক্রান্ত ফল পঁচে যায় ও খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকা আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়ে যায়, ঠিকমত বাড়তে পারেনা, ফলে বাজার দর একদম কমে যায়। এদের আক্রমনের ফলে প্রায় ৫০-৭০ ভাগ ফল নষ্ট হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

(ক) আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

(খ) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ: মাছি পোকার কীড়া আক্রান্ত ফল দ্রুত পঁচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। পোকা আক্রান্ত ফলসমূহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে পারলে, মাছি পোকার বংশ বৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। যেহেতু এ পোকার কীড়াসমূহ মাটির ২-৩ সেমি গভীরে মূটকীট বা পুত্তলিতে পরিণত হয়, সেহেতু আক্রান্ত ফল কমপক্ষে ২০ সেমি পরিমাণ গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

(গ) সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার: পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রী পোকা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে যা সেক্স ফেরোমন নামে পরিচিত। সেক্স ফেরোমনের গন্ধে পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী পোকার সাথে মিলিত হয়। ফলের স্ত্রী মাছি পোকা কর্তৃক নিঃসৃত এমনই একটি সেক্স ফেরোমন বর্তমানে আবিস্কৃত হয়েছে যা রাসায়নিক উপায়ে তৈরি করা সম্ভব। ফেরোমনটির নাম কিউলিউর। কিউলিউর নামক সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করে পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব।

এ পদ্ধতিতে প্লাস্টিকের বাক্স ব্যবহার করা হয় যার দুপাশে ত্রিকোণাকৃতি ফাঁক থাকে। ফাঁদে ব্যবহৃত টোপটিতে স্ত্রী পোকার গন্ধকে কৃত্রিমভাবে ১০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া থাকে। যাতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পোকা বাক্সের ভিতরে বা আশে পাশে স্ত্রী পোকা আছে ভেবে খুঁজতে থাকে। একসময় উড়তে উড়তে বক্সের সাবান পানির মধ্যে পড়ে পোকাটি মারা যায়। এভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ পোকা মারার মাধ্যমে পোকার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করার মাধ্যমে পোকা দমন করা হয়। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ স্কোয়াশ জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। চারা লাগানোর ১ সপ্তাহের মধ্যে জমিতে স্থাপন করতে হবে। প্রতি ২.৫ শতকে ১টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রতি বিঘায় ১৫ টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। একবার ব্যবহারের পর ফেরোমনটিকে আর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। খেয়াল রাখতে হবে পাত্রের তলায় রক্ষিত

সাবান পানি যেন শুকিয়ে না যায়। যত্নের সাথে ব্যবহার কারণে এ ধরণের প্লাস্টিক পাত্রের ফাঁদ ৩-৪ মৌসুম পর্যন্ত অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ তৈরির উপকরণ: ফেরোমন লিউর, প্লাস্টিক বৈয়াম, তার, সাবান গুঁড়া, পানি ও বাঁশের খুঁটি।

ফাঁদ তৈরি ও স্থাপন পদ্ধতি:

১. প্লাস্টিক বৈয়ামের ত্রিকোণাকার ভাবে কাটা অংশের মাঝ বরাবর তার দিয়ে ফেরোমন লিউর / টোপটি ঝুলিয়ে দিতে হবে।

২. গাছের সম উচ্চতায় ফেরোমন ফাঁদটি দুটি খুটির সাহায্যে শক্তভাবে বেধেঁ দিতে হবে। তবে যেহেতু ক্ষতিকর পোকা ফল ও ডগা ছিদ্র করে সেজন্য ফুল ও ডগার কাছাকাছি বয়মটি রাখতে হবে।

৩. বৈয়ামের ভিতরের কর্তিত অংশের ২-৩ সে.মি. পর্যন্ত গুড়া সাবান মিশ্রিত পানি দিতে হবে।

৪. কর্তিত অংশ উত্তর - দক্ষিন মুখ করে ঝুলাতে হবে।

৫. ফেরোমন লিউর/টোপটি যাতে সাবানের পানিতে বা বৃষ্টির পানিতে না ভিজে যায় সেজন্য পানির কিছুটা উপরে রাখতে হবে।

৬. বিভিন্ন কোম্পানী দুইপাশে ত্রিকোনাকার বাক্স তৈরী করে বাজারজাত করছে। তাছাড়া ২লিটার পানির বোতলের দুপাশে আগুনে গরম ছুরি করে সেই ছুরি দিয়ে খুব সহজেই ফাঁদ বক্স তৈরী করা যায়।

ঘ) **বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার:** বিষটোপ ফাঁদে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট হয় এবং মারা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ এই বিষটোপ ফাঁদ তৈরী করছেন। বিষ টোপ ফাঁদ এর ব্যবহার পদ্ধতি হলো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা থেতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম মিপসিন ৭৫ পাউডার অথবা সেভিন ৮৫ পাউডার বা সানটান ৫০ বা সেকুফেন ৮০ পাউডার এবং ১০০ মিলি পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুটির সাহয্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মি উচুতে থাকে। বিষটোপের পাত্রটি ৩টি খুটির মাথায় অন্য একটি বড় আকারের চেপ্টা মাটির পাত্র উপুড় করে দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি বা রোদে নষ্ট না হয়। বিষটোপ তৈরীর পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরী বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বিষটোপ কখনও শুকিয়ে না যায়। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি দুরে দুরে স্থাপন করতে হবে।

ঙ) মাছির আক্রমণ বেশি হলে এসিমিক্স ৫৫ ইসি ১ মিলি/লিটার বা ইমিটাফ ২০ এস এল ১ মিলি/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২) রেড পামকিন বিটল (Red pumkin bettle)

ক্ষতির ধরণ

২০২৫

১. পামকিন বিটলের পূর্ণবয়স্ক পোকা চারা গাছের পাতায় ফুটো করে এবং পাতার কিনারা থেকে খাওয়া শুরু করে সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে।
২. এ পোকা ফুল ও কচি ফলেও আক্রমণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

০১) চারা আক্রান্ত হলে হাত দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে।
০২) ক্ষেত সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।
০৩) চারা রক্ষার জন্য পাতায় ছাই ছিটাতে হবে।
০৪) চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারা গুলো ঢেকে রাখলে এ পোকার আক্রমন থেকে গাছ বেঁচে যায়।
০৫) সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলি অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলি) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে অথবা রিপকড ১ মিলি/ লিটার পানিতে ১০-১২ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

৩) জাবপোকা (Aphids):

ক্ষতির ধরণ

জাবপোকার আক্রমণে স্কোয়াশের বাড়ন্ত ডগা ও পাতা হলুদ হয়ে যায়। গাছ তার সতেজতা হারিয়ে ফেলে এবং ফলন গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক জাবপোকা দলবদ্ধভাবে গাছের পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাকা বিকৃত হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও প্রায়শ নিচের দিকে কোঁকড়ানো দেখা যায়। বাহক হিসাবে ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাবপোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায়।
২. হলুদ ফাঁদ: ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যেন পোকা সেখানে এসে পড়ে এবং আঠাতে আঁটকে যায়।
৩. নিম বীজ দ্রবণ বা সাবান গোলা পানি স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
৪. আক্রমণ বেশি হলে সবিক্রন/টিডো/ইমিটাফ ১ মিলি/লিটার পানিতে স্প্রে করে জাবপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(খ) রোগবালাই

স্কোয়াশের মোজাইক ভাইরাস: মোজাইক ভাইরাস একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগের আক্রমণে ফলন ৯০% কমে যেতে পারে।

ক্ষতির লক্ষণ: বীজ গজানোর পর চারা অবস্থায় বীজপত্র হলুদ হয়ে যায় এবং পরে অঙ্কুরিত চারা নেতিয়ে পড়ে। বয়স্ক গাছের পাতায় হলুদ-সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইকের মতো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো অসম

২০২৫

আকারের। দ্রুত বড় হয়। আক্রান্ত পাতা ছোট, বিকৃত ও নিচের দিকে কুঁকড়ে যায়। আক্রান্ত পাতার শিরা-উপশিরাও হলুদ হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছে ফুল কম আসে এবং আক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে পাতা ও গাছ শুকিয়ে মারা যায়। আক্রান্ত ফল বেঁকে যায় ও গাছের কচি ডগা জটলার মতো দেখায়। ফলের আকৃতি এবড়ো-খেবড়ো দেখায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত গাছ চিহ্নিত করে তা তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।

২. আক্রান্ত গাছ থেকে কোন বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যাবে না।

৩. ভাইরাস প্রতিরোধী স্কোয়াশ জাত ব্যবহার করতে হবে।

৪. নিরাপত্তার জন্য ভূট্টা গাছ স্কোয়াশ ক্ষেতে লাগালে মোজাইক রোগ আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।

৫. ভাইরাসের বাহক পোকা দমনের জন্য হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। জমিতে সাদা মাছি পোকা দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো) ১০ মিলি (২ মুখা) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।

প্রয়োজনীয় সর্তকতা

১. ১টি চারা বের হওয়া থেকে ৫ দিন পর পর সাদা মাছি বা জাব পোকা দমনে কমপক্ষে ভালো কোম্পানির ২/৩ টি ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের ঔষধ ব্যবহার করলে ভাল হয় ।

২. সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

৩. বালাইনাশক ব্যবহার করলে অবশ্যই দামী কোম্পানির ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

৪. ভাইরাস আক্রান্ত গাছকে কোন প্রকার ঔষধ না দিয়ে সরাসরি মাটি থেকে তোলে গাছটি মাটি চাপা দিলে ভাল হয়।

২.৩.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: পরাগায়নের ১৫-২০ দিনের মধ্যে স্কোয়াশ সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। এ সময় ফলের রং সবুজ থাকবে এবং ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। নখ দিয়ে ফলের গায়ে চাপ দিলে নখ সহজে ভিতরে ঢুকে যাবে। স্কোয়াশ পরিপক্ক হলে গাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত বীজ বপন বা চারা রোপণের ৩০ দিন থেকে ৪০ দিনের ভিতর গাছে ফুল এসে ফল ধরা শুরু হয়।

ফসল সংগ্রহ: ধারালো চাকু দিয়ে ফল কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন: শতক প্রতি স্কোয়াশের গড় ফলন ২০০ কেজি। জাত ভেদে ফলন কম বেশি হতে পারে। কোন কোন সময় ফলের সাইজের উপর মোট উৎপাদন কম বেশি হতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ-২.১

১. পুষ্টি বিবেচনায় সালাদ হিসাবে ব্যবহার্য সবজির মধ্যে লেটুসের স্থান সবার উপরে।

২. লেটুসের ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ১৫-২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

৩. পুষ্টি বিবেচনায় সালাদ হিসাবে ব্যবহার্য সবজির মধ্যে টমেটোর পরই ক্যাপসিকাম এর স্থান।

৪. সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উত্তম।

৫. আমাদের দেশে ক্যাপসিকাম এর ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ১৬-২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

৬. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি মিষ্টি মরিচ-১' ও 'বারি মিষ্টি মরিচ-২'নামে ২টি জাত উদ্ভাবন করেছেন।

৭. সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময় ক্যাপসিকাম বীজ বপনের জন্য উপযোগী।

৮. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি স্কোয়াশ-১' নামে ১টি সবজি উদ্ভাবন করেছেন।

৯. ক্যাপসিকাম বোটা সহ সংগ্রহ করতে হবে।

১০. অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় স্কোয়াশ চাষের জন্য উপযোগী।

১১. পরাগায়নের ১০-১৫ দিন পর স্কোয়াশ সংগ্রহ করা যায়।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তোমরা লেটুস, ক্যাপসিকাম ও স্কোয়াশ চাষে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি পোকা/রোগের আক্রান্ত ছবির নমুনা দেওয়া হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগ সনাক্ত করে ফসলের নাম ও দমনের উপায় নির্ধারণ কর।

ক্র/নং	ফসলের নাম	পোকা/রোগের নাম	ছবি দেখে উত্তর লিখ	দমনের উপায়
০১				
০২				
০৩				

০৪				
০৫				
০৬				

অনুসন্ধানমুলক প্রশ্ন

অতএব তুমি ক্যাপসিকাম চাষে বিভিন্ন প্রকার সার সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার বসতবাড়ীর পাশে ১ শতক জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করার পরিকল্পনা করেছ। তাই উক্ত জমিতে তুমি সফলভাবে ক্যাপসিকাম চাষের জন্য সার প্রয়োগ পদ্ধতি ও আন্তঃপরিচর্যা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১) লেটুস চাষের জন্য উপযুক্ত সময় উল্লেখ কর।
২) স্কোয়াশের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৩) কখন ক্যাপসিকাম চাষের উপযুক্ত সময়?
৪) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লেটুসের জাতের নাম লিখ।
৫) লেটুসের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৬) চারা রোপণ পদ্ধতিতে কতদিন বয়সের লেটুস চারা রোপণ করতে হবে?
৭) লেটুস উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?
৮) ক্যাপসিকামের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৯) ক্যাপসিকাম চাষের উপযোগী তাপমাত্রা কত?
১০) ক্যাপসিকামের ২টি জাতের নাম লিখ।
১১) ক্যাপসিকাম চাষের প্রধান সমস্যা কোন রোগ?
১২) স্কোয়াশ চাষের উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?
১৩) স্কোয়াশের একটা জাতের নাম লিখ।
১৪) পরাগয়নের কতদিন পর স্কোয়াশ সংগ্রহ করতে হয়?
১৫) সেক্স ফেরোমন ফাঁদ জমিতে কত দূরে দূরে স্থাপন করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১) বিভিন্ন শ্রেণির/টাইপের লেটুসের নাম লিখ।
২) ক্যাপসিকামের ব্যবহার লিখ।
৩) লেটুসের জন্য কোন জলবায়ু উত্তম?
৪) সালাদ হিসাবে লেটুসের পুষ্টিগুণ উত্তম কেন?
৫) স্কোয়াশের মালচিং গুরুত্বপুর্ণ কেন?
৬) লেটুস সংগ্রহের পরিপক্কতার লক্ষণ কি।
৭) উচ্চমূল্য সবজি বলতে কি বুঝায়?
৮) ২টি ক্যাপসিকাম জাতের বৈশিষ্ট লিখ।
৯) প্রতি ১০০ গ্রাম ক্যাপসিকামে কি কি খাদ্য উপাদান আছে।

১০) ক্যাপসিকাম বীজ লাগানোর আগে কিভাবে বীজ শোধন করতে হয়?

১১) ক্যাপসিকাম সংগ্রহের পরিপক্কতার লক্ষণ কি।

১২) স্কোয়াশের জাতের বৈশিষ্ট লিখ?

১৩) স্কোয়াশের কৃত্তিম পরাগয়ান কিভাবে করা যায়?

১৪) পলিব্যাগের চারা কখন খোলা ও কখন ঢেকে রাখতে হবে।

১৫) স্কোয়াশের ক্ষেতে কি কি আগাছা ক্ষতি করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১) লেটুসের জন্য জমি তৈরি এবং সার প্রয়োগ কিভাবে করতে হয় বর্ণনা দাও।

২) স্কোয়াশের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩) লেটুসের বীজ বপন ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪) লেটুসের পোকা দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৫) ক্যাপসিকাম চাষের জন্য বেড তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।

৬) ক্যাপসিকামের চারা রোপণ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

৭) ক্যাপসিকামের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮) স্কোয়াশের মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।

৯) স্কোয়াশের চারা রোপন এবং অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

১০) সেক্স ফেরোমন ফাঁদের উপকরণ ও ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

জব ২.১: লেটুস ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

- জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।
- বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।
- সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।
- সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে লেটুস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নর্ধািরণ ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

লেটুস চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির অম্লতা ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। নিক্তি ১৩। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৪। খন্তা ১৫। টুকরি ১৬। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২) নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতকপ্রতি ১ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৩) জমির পাশে উঁচু স্থানে ৩×১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে।

৪) মূল জমিতে প্রতি শতকে ২৫ কেজি জৈব সার, ৩০০ গ্রাম টিএসপি সার, এমওপি ৩০০ গ্রাম, রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

৫) লেটুস পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরূপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬) বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৭) প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতক জমি		
	চারা রোপনপর ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩৫ দিন পর
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম

৮) লেটুস চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে / আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

৯) ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

১০) পরিপক্কতার **লক্ষণ** দেখে রোপনের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর থেকে লেটুস সংগ্রহ করতে পারবে।

১১) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: সফলতার সাথে লেটুস চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল: আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.২: ক্যাপসিকাম ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।

২. বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।

৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।

৪. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম সংগ্রহ ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

ক্যাপসিকাম চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। নিক্তি ১৩। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৪। খন্তা ১৫। টুকরি ১৬। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১. ক্যাপসিকাম চাষের জন্য আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।
২. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ১.৫-২.০ গ্রাম (চারা রোপনের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
৩. জমির পাশে উচু স্থানে ৩×১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় চারা উৎপাদন ও পরিচর্যা করতে হবে। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে।
৪. মূল জমিতে প্রতি শতকে ৪০ কেজি জৈব সার, ১.৫০ কেজি টিএসপি সার, এমওপি ১.০০ কেজি, রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।
৫. ক্যাপসিকাম পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরুপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচের দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৬. বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।
৭. প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও পটাশ সারের উপরিপ্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি শতক জমি		
	পিটে বা গর্তে	চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর
ইউরিয়া	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম
এমওপি	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম	৩৩৩ গ্রাম

৮. ক্যাপসিকাম চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে / আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।প্রয়োজনীয় বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

৯. ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

১০. ফসল তোলার ১৫ দিন আগে থেকেই যে কোন ধরনের ঔষধ স্প্রে করা উচিত নয়।

১১. পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে চারা রোপনের ৬০ থেকে ৭০ দিন পর থেকে বোটা সহ ক্যাপসিকাম সংগ্রহ করতে পারবে।

১২. প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: সফলতার সাথে ক্যাপসিকাম চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল: আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.৩: স্কোয়াশ ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।

২. বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার সংগ্রহ ও প্রয়োগ করতে পারবে।

৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।

৪. সঠিক সময় ও পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনের জন্য ফাঁদ তৈরি করতে পারবে।

৫. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে স্কোয়াশ সংগ্রহ,সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ চেক ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূঁবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিস্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

স্কোয়াশ চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও স্কোয়াশ ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। জৈব ও রাসায়নিক সার ১২। নিক্তি ১৩। প্লাষ্টিকের বৈয়াম ১৪।কিউ লিয়র ১৫। খন্তা/শাবল ১৬। টুকরি ১৭। খাতা-কলমও পেন্সিল।

কাজের ধারা

১. আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।
২. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের মধ্যে বপণ সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ১০ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
৩. চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভালো হয়। চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে মূল জমিতে মাদায় চারা রোপণ করতে হবে।
৪. বেডের উচচতা ১৫-২০ সেমি. ও প্রস্থ ১-১.২৫ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৭০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে।
৫. গত/ মাদার ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি. গভীরতা ৫০-৫৫ সেমি. এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি. প্রশস্ত হবে। ৬০ সেমি. প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা থেকে ৫০ সেমি. বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে চারা লাগাতে হবে।
৬. প্রতি মাদায় ১০ কেজি জৈব সার এবং ৬০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম এমওপি, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ৮ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

৭. মাটিতে "জো" এলে পরের দিন মাদার মাটি ভালভাবে ওলটাপালট করে দিতে হবে।অত:পর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ ১৬-১৭ দিনের চারা বিকাল বেলায় প্রতি মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হবে এবং রোপণের পর ঝাঁঝরি দিয়ে নিচু করে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে।

৮. স্কোয়াশ পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাড়াতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরুপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারনে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। মাদায় বা বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে।

১০. প্রতি মাদায় নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও এমওপি সারের উপরি প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	প্রতি মাদায়		
	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর
ইউরিয়া	-	১১. ৩৫০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম
এমওপি	১২. ৫০ গ্রাম	১৩. ৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম

১১) গাছের গোড়ার দিকের শোষক শাখা গুলো ব্লেড দিয়ে অপসারণ করতে হবে।

১২) সকাল ৮-১০ টা পর্যন্ত অথবা সকালে যতক্ষণ পর্যন্ত রোদের তাপ কম থাকে পুরুষ ফুল ছিঁড়ে ফুলের পাপড়িগুলো অপসারণ করে এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেনু থাকে) স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের কাছাকাছি নিয়ে সংস্পর্শ ছাড়াই পুরুষ ফুল আস্তে করে টোকা দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হয়।

১৩) চারা/গাছকে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে।

১৪) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩. কৃত্রিম পরাগায়নের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুরুষ ফুলের পরাগদানী যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পরাগরেনু ভালভাবে গর্ভমুন্ডের উপর পতিত হয়।

অর্জিত দক্ষতা

সফলতার সাথে স্কোয়াশ চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ছাদে সবজি ও ফল চাষ
(Rooftop Gardening)



বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত জনবহুল দেশ। এখানে জনসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি খুবই কম। প্রতি বছর এদেশের জনসংখ্যা, আবাসনের জন্য ঘর-বাড়ি, যোগাযোগের জন্য রাস্তা এবং কলকারখানা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দিনদিন কমে যাচ্ছে আবাদি জমি। বাংলাদেশ এই বাড়তি জনসংখ্যার চাপ মোকাবেলার জন্য শুধু আবাদি জমির উপর নির্ভর করলে চলবে না। এ পরিস্থিতিতে বড় বড় দালানের ছাদ চাষের আওতায় আনা যেতে পারে।

ছাদের উপর সবজি ও ফলের চাষ এটি সাধারণ চাষেরই প্রতিরূপ যা একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয়। বিশেষ করে শহরে লোকজন তাদের বাড়ির ছাদে টব, বালতি, ড্রাম বা ট্রেতে সীমিত আকারে সবজি ও ফল চাষ করেন। একটা সুন্দর ছাদ বাগান দিতে পারে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও সারা বছর ধরে পরিবারের চাহিদা মতো নিরাপদ ফল ও সবজি।

এই অধ্যায় শেষে

১। ছাদ বাগানে চারা রোপণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে মাটির মিশ্রণ তৈরি করতে পারবে

২। ছোট ছোট মাটির বা প্লাস্টিকের টব/ পটে চারা উৎপাদন করতে পারবে

৩। টব/ ড্রামে সবজি ও ফল চাষ করতে পারবে

৪। সবজি ও ফল গাছের আন্তঃপরিচর্যা করতে পারবে

৫। সবজি ও ফল সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে পারবে

৩.১. ছাদ বাগান: পাকা বাড়ির খালি ছাদে অথবা বেলকনি/বারান্দাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফুল, ফল, শাকসবজির বাগান গড়ে তোলাকে ছাদ বাগান বলা হয়। এখানে টব, বড় বড় ড্রাম কিংবা ট্রেতে নানা ফুল, ফল ও সবজি রোপণ করা হয় । কেউ কেউ আবার ছাদে স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করে তাতে গাছ রোপণ করেন। ছাদের আকার ও সহনশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে নানা কাঠামোর ওপর টব, মাচা স্থাপন করা হয়। ছাদ বাগান নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনের সহজ উপায় এবং বাড়ির ছাদসহ দালান ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে।

৩.২. ছাদ বাগানের নকশা প্রণয়ন

ছাদে বাগান করার জন্য আবশ্যিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১। ছাদে বাগান করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিয়মিত পানি সেচ দেয়া।

২। ছাদে বাগানের জন্য গোবর, জৈব সার (কম্পোস্ট), কেঁচো সার (ভার্মিকম্পোস্ট), ট্রাইকোকম্পোস্ট ও কোকোডাস্ট (নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সহজে তিন ভাগ দোআঁশ মাটি, পাঁচ ভাগ গোবর, এক ভাগ ভার্মিকম্পোস্ট সার এবং এক ভাগ কোকোডাস্ট দিয়ে মাটির মিশ্রণ তৈরি করতে হয়।

৩। বছরে একবার কম্পোস্টযুক্ত নতুন মাটি দিয়ে পুরাতন মাটি বদলিয়ে দিতে হবে।

৪। টবে/পাত্রের নিচে ছিদ্র থাকা জরুরী। কয়েকটি ভাঙ্গা চাড়ির টুকরা বা পাথর ছিদ্রের মুখের উপর রেখে টবে মাটি ভরতে হবে।

৫। টবে/ড্রামে সবজি/ ফলের ধরণ ও জাত নির্বাচনের পর যৌক্তিকভাবে সাজাতে হয়। ছোট গাছকে সামনে, বড়/লতানো সবজি গাছকে পিছনে রাখতে হবে। যেমন, বড় লতানো গাছ উত্তর ও পশ্চিম দিকে দিতে হবে।

৬। ছাদে বাগান করার ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল জাতের সবজি চারা ব্যবহার বেশি ফলদায়ক।

৭। ফলের চারার ক্ষেত্রে উন্নত জাতের সুস্থ-সবল চারা/কলম বিশ্বস্ত নার্সারি বা কৃষি বিভাগের হর্টিকালচার সেন্টার, গবেষনা প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করতে হবে।

৮। ছাদে চাষের একটা জরুরী বিষয় হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। এ জন্য পুরাতন রোগাক্রান্ত, বয়স্ক ডালপালা, পাতা সাবধানতার সাথে সিকেচার দিয়ে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। এতে গাছপালা রোগমুক্ত থাকবে এবং মানসম্পন্ন ফলন পাওয়া যাবে।

৯। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় যে কোন ফল জাতীয় সবজিতে পোকা বা রোগের আক্রমণ অহরহ ঘটে থাকে। সেক্ষেত্রে সপ্তাহে কমপক্ষে ২/৩ বার ছাদের বাগান পরিদর্শন করে আক্রান্ত ফল বা ডগা ছেটে ফেলে দিলে পোকা বা রোগের আক্রমণ কমে যাবে এবং ফলন ভাল পাওয়া যাবে।

১০। সহজে পোকামাকড় দমনের জন্য আঠালো হলুদ ফাঁদ, আঠালো সাদা ফাঁদ ও সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১১। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ঘরের ভেতরে, সিড়ি, ব্যালকনি, বারান্দা, কার্নিশ এসব জায়গায় অনায়াসে পাতা জাতীয় সবজি গাছ বা লতানো সুদৃশ্য গাছ লাগিয়ে সবুজ পরিবেশ তৈরি করে পরিবেশ সুন্দর করা হয়।

বাড়ির ছাদে ফসল চাষে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

১। ছাদের স্থান নির্বাচন ২। ছাদের আকার ৩। সূর্যালোক ৪। পানির সরবরাহ ৫। ছাদের গঠন ৬। ছাদের ব্যবহার ইত্যাদি।

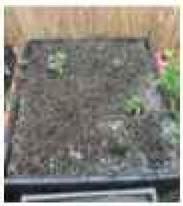
৩.৩. সবজি ও ফল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

মাধ্যম বা গ্রোয়িং মিডিয়া:

ভাল ফলন পাওয়ার প্রথম শর্ত হল উন্নতমানের গ্রোয়িং মিডিয়া ব্যবহার করা। ছাদে বাগানের জন্য উন্নতমানের কম্পোস্ট সমৃদ্ধ হালকা বুনটের মাটি ব্যবহার করা উত্তম। আবার কিছু কিছু পটিং মিডিয়ার মিশ্রণ যেমন- পিটমস, ভার্মিকুলাইট, কোকোপিট ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো হালকা, রোগজীবাণু মুক্ত, আগাছা বীজ মুক্ত এবং সুনিষ্কাশন ক্ষমতাসম্পন্ন।



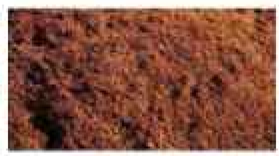
ভার্মিকম্পোস্ট



পিটমস



ভার্মিকুলাইট



কোকো ডাস্ট

চিত্র: গ্রোয়িং মিডিয়া

আদর্শ গ্রোয়িং মিডিয়ার উদাহরণ:

১। ৫ ভাগ দোআঁশ মাটি + ৫ ভাগ কম্পোস্ট এর মিশ্রণ

২। ৩ ভাগ দোআঁশ মাটি + ৫ ভাগ গোবর + ১ ভাগ ভার্মিকম্পোস্ট + ১ ভাগ কোকোডাস্ট এর মিশ্রণ

৩। ১০০% মাটি ছাড়া মিশ্রণ, যেমন- পিটমস, ভার্মিকুলাইট, ককোডাস্ট ইত্যাদির মিশ্রণ

ছাদ বাগানের জন্য পট বা কনটেইনার

ছাদ বাগানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ও আকারের টব, প্লাস্টিকের/কাঠের বক্স, হাফ ড্রাম বা কনটেইনার ব্যবহার করা যায়। ফসলের আকার আকৃতির উপর ভিত্তি করে কনটেইনারও বিভিন্ন আকারের হতে পারে। নিম্নে কিছু পটের নামসহ উল্লেখ করা হলঃ

১। টবে চাষ: টব বিভিন্ন আকার এবং বিভিন্ন পদার্থের তৈরি হতে পারে। টব মাটির, প্লাষ্টিক বা সিমেন্টের তৈরি হতে পারে। সাধারণত সবজি চাষাবাদের জন্য ১২-১৮ ইঞ্চি ব্যাস এবং ১২-১৮ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট টব ব্যবহার করা যেতে পারে। টবগুলো স্থানান্তর যোগ্য এবং পাতলা বিধায় টবে সবজি চাষ জনপ্রিয়। এসব টবে স্ট্রবেরি, বিভিন্ন ফুলের চারা, টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রোকলি, কুমড়া জাতীয় সবজি (লাউ, করলা, শসা, মিষ্টি কুমড়া) ও সীমের চারা রোপণ করা উত্তম।

২। চৌবাচ্চাকৃতি প্লাস্টিক/কাঠ/স্টীল/ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি পাত্র বা বক্সে চাষ: চৌবাচ্চাকৃত পাত্রগুলো প্লাস্টিক/কাঠ/স্টীল/ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হতে পারে। এ ধরনের পাত্রগুলো ১০-১২ ইঞ্চি গভীরতা, তিন ফুট প্রস্থ এবং পাঁচ/ছয় ফুট লম্বা আকারের হতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী পাত্রের আকার ছোট বা বড় হতে পারে। এ পাত্রগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী মিস্ত্রি দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে বা বাজার হতে ক্রয় করা যাবে। পাত্রগুলো ছাদের ওপরে কয়েকটি ইট বা অন্য কোন অল্প উঁচু স্থাপনার ওপর রাখতে হবে যাতে পাত্রের নীচে ফাকা থাকে, এতে ছাদের কোন ক্ষতি হবে না। এসব পাত্রে শাক জাতীয় সবজির বীজ সরাসরি বপন ও টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রোকলি, কুমড়া জাতীয় সবজি (লাউ, করলা, শসা, মিষ্টি কুমড়া) ও সীমের চারা রোপণ করা যেতে পারে।

৩। হাফ ড্রামে সবজি ও ফল চাষ: বড় আকারের ড্রামের মাঝামাঝি কেটে দুই টুকরো করে বড় দুটি ড্রামের টব তৈরি করা যায়। আম, লিচু, কলা, লেবু, সজনে, কচু চাষের জন্য হাফ ড্রাম ভালো। এগুলো সরাসরি ছাদের ওপর না বসিয়ে কয়েকটি ইটের ওপর বা স্টীলের ফ্রেমে বসানো দরকার।

৪। মাল্টিলেয়ার বস্তায়/বক্সে সবজি চাষ: মাল্টিলেয়ার বস্তায়/বক্সে সবজি চাষ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খাটো শিকড়যুক্ত সবজি নির্বাচন করতে হবে। বিশেষ করে পাতা জাতীয় সবজি গাছ লাগিয়ে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে।



চিত্র: মাল্টিলেয়ার বস্তায়/বক্সে সবজি চাষ

২০২৫

উপোরক্ত পাত্রগুলোর নিচে অবশ্যই ছিদ্র থাকা জরুরী। কয়েকটি ভাঙ্গা চাড়ির টুকরা বা নেট ছিদ্রের মুখে দিয়ে পাত্রগুলোতে মাটি ভরতে হবে।

৩.৪. চারা উৎপাদন

গুণগত মানের বীজ সংগ্রহ করার পর সবজি ভেদে বীজ সরাসরি বপন বা টবে চারা গজিয়ে তারপর রোপণ করতে হবে।

সরাসরি বীজ বপণ: সাধারণত শাক জাতীয় সবজির ক্ষেত্রে সরাসরি বীজ বপন করতে হয়। যেমন: ডাটা, লাল শাক, কলমী শাক, পালং শাক, পুই শাক, লেটুস, সিলারী, পার্সলী, মুলা, গাজর, ধনিয়া ইত্যাদি। তাছাড়া ঢেঁড়শ চাষেও সরাসরি বীজ বপন করতে হয়।



চিত্র: সরাসরি বীজ বপন



চিত্র: চারা উৎপাদন

চারা গজিয়ে তারপর রোপন: টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রোকলী, লাউ, করলা, শসা, মিষ্টিকুমড়া, সীম ইত্যাদি।

- চারা উৎপাদন ছায়াবিহীন, পরিষ্কার এবং বাতাস চলাচলের উপযোগী স্থানে করা প্রয়োজন।
- চারা উৎপাদনের মাটি বেলে দো-আঁশ এবং উর্বর হওয়া উচিত।
- চারা পলিথিনের ব্যাগে বা মাটির টবে উৎপাদন করা যায়।
- আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আচছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সুর্যতাপ থেকে চারাকে রক্ষা করা যায়।

৩.৫. ছাদে গাছ রোপণ: ছাদে বাগান তৈরিতে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে উন্নত জাতের সুস্থ-সবল চারা/কলম সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বাগানে যেসব দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি ফল গাছ রোপণ করা হবে তা বারোমাসী জাতের হলে ভালো হয়। অন্যথায় ৫-৬ মাস একাধারে ফল পাওয়া যায় এমন জাতের গাছ রোপণ করা উচিত। খুব কম সময় ধরে ফল পাওয়া যায় (লিচু) এমন গাছ ছাদের জন্য নির্বাচন করা ঠিক না। বাগানকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তা সব সময় কোনো না কোনো গাছে ফুল, ফল ও সবজি ধরা অবস্থা বিরাজ করে।

২০২৫

ফল গাছ: আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বারোমাসী লেবু (কাগজি, সিডলেস, এলাচি), মাল্টা, কমলা, বাতাবিলেবু, কুল (টক ও মিষ্টি), ডালিম, শরিফা, সফেদা, আমলকী, বারোমাসী আমড়া, জামরুল, অরবরই, বিলিম্বি, করমচা, ড্রাগন ফল অন্যতম। তবে যে গাছই রোপণকরা হোকনা কেন তা যেন অবশ্যই কলমের গাছ হয়।

শাকসবজি: বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়স, ক্যাপসিকাম, শিম, বরবটি, শসা, করলা, লাউ, ধুন্দল, বারোমাসী সজিনা, লালশাক, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক, ব্রোকলি, মুলা ইত্যাদি।

মসলা জাতীয়: মরিচ, ধনেপাতা, বিলাতি ধনিয়া, পুদিনা, কারিপাতা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, গোলমরিচ ইত্যাদি।

ঔষুধিগুণ বিশিষ্ট: অ্যালোভেরা, তুলসী, থানকুনি, চিরতা, স্টিভিয়া, গাইনোরা ইত্যাদি।

ফুল জাতীয়: গোলাপ, বেলী, টগর, জুঁই, গন্ধরাজ, জবা, অর্কিড, টিকোমা, জারবেরা, শিউলি, এলামন্ডা, বাগানবিলাশ ও বিভিন্ন মৌসুমি ফুল।

৩.৬. ছাদ বাগান ব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতি

ছুরি/চাকু, কাঁচি, খুরপি, নিড়ানী, সিকেচার, প্রুনিং শেয়ার, হ্যান্ডি-শাবল, ট্রাওয়েল, শাবল, বেলচা, কোদাল, হ্যান্ডস্প্রেয়ার, পানির পাইপ, পানির ঝাঝরি, ঝাড়ু, চালুনী, ট্রলী, ওজন যন্ত্র ছাদের বাগানে কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা আবশ্যক।



চিত্র: ছাদ বাগান ব্যবস্থাপনার যন্ত্রপাতি

৩.৭. আন্তঃপরিচর্যা

গাছের অবস্থান নির্ণয়

কোন কোন গাছ বেশি রোদ পছন্দ করে (কাগজি লেবু, ড্রাগন ফল), কোন গাছ আধা ছায়ায় ভালো হয় (এলাচি লেবু, জামরুল), আবার কোনো গাছ ছায়া পছন্দ করে (লটকন, রামবুটান) । এজন্য ছাদ বাগান থেকে বেশি সুফল পেতে ছাদে রোদের/আলো-বাতাস প্রাপ্তি অবস্থা বুঝে গাছের অবস্থান চূড়ান্ত করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ : মাছ, মাংস ও তরকারি ধোয়া পানি গাছে ব্যবহার করলে গাছের খাবারের অভাব কিছুটা পূরণ হয়। এছাড়াও মিশ্র সার, হাড়ের গুড়া মাঝে মাঝে এবং অনুখাদ্য (দস্তা, বোরন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ) বছরে একবার প্রয়োগ করা ভালো। মাছের কাঁটা, হাড়ের টুকরা, ডিমের খোসা, তরিতরকারির পরিত্যক্ত অংশ, পাতা, একটা ড্রামে পঁচিয়ে নিয়ে ছাদ বাগানে ব্যবহার করা ভালো। কয়েক বছরের বয়স্ক গাছের গোড়ার চারধারে সাবধানে কিছু মাটি উঠিয়ে ফেলে নতুন ভাবে পটিং মিডিয়া দিয়ে ভরাট করা হলে গাছের স্বাস্থ্য ফেরানো সহজ হয়। সম্ভব হলে গাছকে ছাঁটাই করে কিছু মাটিসহ উঠিয়ে নিয়ে সার মিশ্রিত মাটি পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ছাড়া আগানো উচিত হবে না। জেনে শুনে অভিজ্ঞ মালীকে সাথে নিয়ে তা করা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত ছোট টব থেকে বড় টবে গাছ অপসারণ করার মাধ্যমে গাছকে স্বাস্থ্যবান করা যায়। যারা ছাদ বাগানে অভিজ্ঞ তাদের বাগান পরিদর্শন করে ও সফলতার দিকগুলো জেনে বা দেখে শিখে তা নিজ বাগানে প্রয়োগ করা উত্তম।

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা

১। ছাদে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মাটির আর্দ্রতার অভাবের জন্য সহজেই গাছপালা নেতিয়ে যাবে তেমনি অতি পানি বা অতি আর্দ্রতার জন্যও গাছ নেতিয়ে মরা যেতে পারে। তাই অবশ্যই ছাদের বাগানে পরিমিত সেচের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

২। ছাদ বাগানে ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিতে হবে।

৩। পাত্রে চারা লাগানোর পরপরই গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং কয়েকদিন পর্যন্ত পরিমিত সেচ দিতে হবে।

৪। প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফুল, ফল ধারণ ব্যাহত হয় এবং যেসব ফুল, ফল ধরেছে সেগুলোও আস্তে আস্তে ঝরে যায়। কাজেই প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য নীচের নিকাশ ছিদ্র ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে।

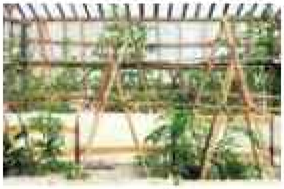
বাউনি/জাংলা/মাচা/খুঁটি দেওয়া

লতানো গাছে কাংখিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই সুন্দরভাবে বাঁশ/ পিলার দিয়ে জাংলা বা মাচা বানিয়ে টব/প্লাস্টিকের পাত্রে লতানো সবজি চাষ করা যেতে পারে। মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে যায়, পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।ফল গাছে খুটি দিয়ে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দিতে হবে।

মালচিং: সেচের পর মাটিতে চটা বাঁধে। চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। গাছে খাদ্যোপাদানের অভাব পড়ে। ফলে কাংখিত ফলন পাওয়া যায় না। তাই সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

অপ্রয়োজনীয়, বয়স্ক, মরা শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট ডালপালা হয়। সেগুলোকে শোষক শাখা বলা হয়। তাছাড়া এগুলো ছাড়াও বয়স্ক, মরা ডালপালা গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই গাছের গোড়ার দিকে ডালপালাগুলো ধারালো কাঁচি বা সিকেচার দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।



চিত্র: মাচা ও বাউনি দেওয়া



চিত্র: অপ্রয়োজনীয়, বয়স্ক, মরা শাখা সিকেচার দিয়ে অপসারণ



চিত্র: আঠালো হলুদ ফাঁদ



চিত্র: হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন

পোকামাকড় দমন: পোকামাকড় ব্যবস্থাপনার জন্য আঠালো হলুদ ফাঁদ, আঠালো সাদা ফাঁদ, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া কিছু পোকা হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা যায়।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ন: লাউ, কুমড়া, করলা, ধুন্দল, ঝিঙ্গাতে পরাগায়ন প্রধাণতঃ মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। উঁচু বিল্ডিং এর ছাদে চাষ করলে মৌমাছির আনাগোনা কমে যায়। সব ফুলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন ঘটে না এবং এতে ফলন কমে যায়। তাই হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করে ফলন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৩.৮. ফসল সংগ্রহ: পরিপক্কতার উপর ভিত্তি করে ছাদ বাগান হতে সবজি ও ফল আহরণ/সংগ্রহ করতে হবে। যতই সবজি ও ফল সংগ্রহ করা হবে ততই সবজি-ফল ধারণ বৃদ্ধি পাবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১। ছাদে বাগানের জন্য উন্নতমানের কম্পোস্ট সমৃদ্ধ হালকা বুনটের মাটি ব্যবহার করা উত্তম।

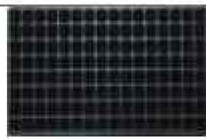
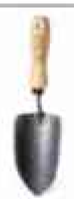
২। ছাদ বাগানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ও আকারের টব, প্লাস্টিকের/কাঠের বক্স, হাফ ড্রাম বা কনটেইনার ব্যবহার করা যায়।

৩। ছাদ বাগানে দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি ফল গাছ রোপণ করা এবং তা বারোমাসী জাতের হলে ভালো হয়।

৪। কুমড়া জাতীয় সবজির ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়ন এর ব্যবস্থা করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

এসো নিজে করি

ইতিমধ্যে তোমরা ছাদ বাগানে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছ। নিচের ছবিগুলো দেখে নাম লিখ এবং ছাদ বাগানে এদের ব্যবহার উল্লেখ কর।

যন্ত্রপাতির নাম	ছবি	ব্যাবহার
		
		
		
		
		

অনুসন্ধান মূলক প্রশ্ন

অতএব তুমি ছাদ বাগানে সবজি ও ফল চাষ সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার বাসার ছাদে একটি ছাদ বাগান করার পরিকল্পনা করেছ। তোমার বাসার ছাদে সফলভাবে একটি ছাদ বাগান করার জন্য প্রাথমিকভাবে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছাদ বাগানে কি ধরনের মাটি ব্যবহার করা হয়?
২. ছাদ বাগানে কি কি গ্রোয়িং মিডিয়া ব্যবহার করা হয়?
৩. ছাদ বাগানে কোন ধরনের সব্জির ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়ন করা হয়?
৪. ছাদ বাগানের কোন ধরনের সব্জির ক্ষেত্রে মাচা দিতে হয়?
৫. ছাদ বাগানে পোকামাকড় দমনে কি ধরনের ফাঁদ ব্যাবহার করা হয়?
৬। গাছের ডালপালা ছাঁটাই করার যন্ত্রের নাম কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ছাদ বাগানে কি কি ধরনের ফলের চাষ করা যায়?
২. ছাদ বাগানে কি কি ধরনের সব্জির চাষ করা যায়?
৩. ছাদ বাগানে কি কি ধরনের ফুলের চাষ করা যায়?
৪. ছাদ বাগানে টবে চাষ করা যায় এমন পাঁচটি ফসলের নাম লিখ|
৫. ছাদ বাগানে ব্যবহারযোগ্য তিনটি আদর্শ গ্রোয়িং মিডিয়ার নাম লিখ|
৬। ছাদ বাগানে ব্যবহার করা হয় এমন ১০ টি যন্ত্রপাতির নাম লিখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ছাদ বাগানের চারা উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
২. ছাদ বাগানের জন্য মাটি তৈরি ও গাছ রোপণ সম্পর্কে আলোচনা কর।
৩. ছাদ বাগানের ফসলের আন্তঃপরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

শিখন ফল

১। প্রয়োজন অনুযায়ী টব নির্বাচন করতে পারবে।
২। টবের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি সরবরাহ ও প্রস্তুত করতে পারবে।
৩। টবের জন্য উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করতে পারবে।
৪। টবে গাছ রোপণ ও ছাদে গাছের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে।
৫। রোপণকৃত গাছের পরিচর্যা করতে পারবে।

জব ৩.১: টবে গাছ লাগানোর দক্ষতা অর্জন

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ শনাক্ত ও সংগ্রহ করা

৩। হ্যান্ড গ্লাবস পরিধান করা

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিস্কার করা

৫। অব্যাবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

মানুষ সৃজনশীল ও সৌন্দর্য্য প্রেমী। নিজের খেয়ালে যে কয়টি কাজ করে মানুষ তৃপ্ত হয় এর মধ্যে বাগান করা অন্যতম। তাই আপনিও নিজের শখের মূল্য দিতে বাড়ির সামনে বাগান করার জায়গা না থাকলেও বাড়ির ছাদে, বারান্দায় কিংবা কার্নিশে বাগান তৈরি করতে পারেন। টবে সবজী, ফুল ও ফলের চাষ করা যায়। তবে টবে গাছ লাগানোর আগে ও পরে কিছু নিয়ম নীতি জেনে রাখা জরুরি। সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্যা করলে টবের গাছটিও বেড়ে উঠবে সুন্দর করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। মাটি, ২। টব, ৩। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৪। বীজ/চারা, ৫। নিড়ানি, ৬। খুরপি, ৭। খুটি, ৮। রশি, ৯। টুকরি, ১০। ঝাঁঝরি, ১১। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। গাছের আকার ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের টব ব্যবহার করতে হবে। বীজ বুনে চারা উৎপাদনের জন্য চওড়া ও অগভীর টব। মৌসুমী সবজি ও ফুলের জন্য মাঝারী আকৃতির এবং বর্ষজীবী, বহুবর্ষজীবী ও ঝোপ জাতীয় গাছের জন্য বড় আকারের টব প্রয়োজন। মাটির তৈরি কাঠ, কংক্রিট, সিরামিক এবং প্লাস্টিকের তৈরি টব ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। পানি চুয়ানোর জন্য টবেব নিচে ২/১ টি ছিদ্র থাকা প্রয়োজন। ছিদ্রযুক্ত টবেব নিচে ভাঙ্গা চাড়া, ঝামা, নারিকেলের ছোবড়া, খড়কুটা বা ইটের টুকরো দিয়ে বন্ধ করে তার উপর কিছু শুকনো পাতা দিতে হবে।

৩। এরপর বেলে মাটি এবং তার উপর জৈব সার সমৃদ্ধ দোআশ মাটি দিয়ে টব এমনভাবে ভর্তি করে দিতে হবে যেন ওপরে অন্তত এক ইঞ্চি পরিমাণ খালি থাকে।

৫। নতুন কিংবা পুরাতন উভয় প্রকার টবই ব্যবহারের আগে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

৬। টবের জন্য উপযুক্ত গাছ নির্বাচন করতে হবে।

৭। টবে সজির/ফুলের চারা বীজতলা থেকে অথবা ছোট টব থেকে স্থানান্তর করে বড় টবে রোপণ করতে হবে। ফলের চারার ক্ষেত্রে উন্নত জাতের কলমের চারা রোপণ করতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে মাটি শক্ত করে দিতে হবে, যাতে চারাগাছ হেলে না পড়ে বরং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

৮। সদ্য লাগানো চারা কয়েকদিন ছায়ায় রেখে সহনশীল করে নিতে হয়। যদি সম্ভব না হয় তাহলে কলা বা সুপারী গাছের খোল কেটে অথবা অন্য উপায়ে চারাগুলো রৌদ্র থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এ অবস্থায় সকালে-বিকালের রোদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। ছাদ বাগান থেকে বেশি সুফল পেতে ছাদে রোদের/আলো-বাতাস প্রাপ্তি অবস্থা বুঝে গাছের অবস্থান চূড়ান্ত করতে হবে। যেমন: রোদ পছন্দ কারী (কাগজি লেবু, ড্রাগন ফল, সবজি), আধা ছায়ায় ভালো হয় (ফুল, মরিচ, এলাচি লেবু, জামরুল) এবং ছায়া পছন্দ কারী (আদা, লটকন, রামবুটান) গাছ।

১০। প্রতিটি কাজ ধারাবাহিকভাবে ব্যাবহারিক খাতাই লিখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। টবে অতিরিক্ত পানি দেয়া যাবেনা

২। জৈব/রাসায়নিক সার টবের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে

৩। টবের গাছ যেন অতিরিক্ত লম্বা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা / ফলাফল

টবে গাছ লাগানোর সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছো।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়
শিম, বরবটি ও ঢেঁড়স চাষ
(Cultivation of Country Bean, Yard Long Bean and Lady's Finger)






বরবটি ও ঢেঁড়স গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের অন্যতম প্রধান সবজি। শিম শীতকালীন সবজি হলেও বর্তমানে গ্রীষ্মকালে এর চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। সবজিগুলো প্রোটিন এবং আঁশ জাতীয় উপাদান সমৃদ্ধ যাহা মানব দেহের জন্য উপকারী। বাংলাদেশের সর্বত্র সবজিগুলো বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়ীতে চাষ হচ্ছে। এ অধ্যায়ে আমরা শিম, বিরবটি ও ঢেঁড়স চাষ নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় শেষে-

- চাষযোগ্য সবজিসমূহের নাম ও পরিচিতি লিখতে পারবে
- শিম, ববরবটি ও ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজিগুলোর বিভিন্ন পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার বলতে পারবে
- উপর্যুক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, জলবায়ু ও মাটি, বিভিন্ন জাত এবং সবজির চাষ মৌসুম বর্ণনা করতে পারবে
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে আধুনিক পদ্ধতিতে উক্ত সবজিগুলোর চাষাবাদ ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- উক্ত ফসলগুলোর উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতিতে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করতে পারবে
- উপর্যুক্ত সবজিগুলোর চাষাবাদে ক্ষতিকর বালাই সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা নিতে পারবে

৪.১ দেশি শিম (Country Bean)

শিম বাংলাদেশের একটি অতি জনপ্রিয় ও উপাদেয় সবজি। শিমের কচি শুঁটি এবং পরিপক্ক বীজ উভয়ই খাওয়া যায়। শিম সবজি হিসাবে দেশের সবত্র বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়িতে চাষ হচ্ছে।

৪.১.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: দেশি শিম বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সবজি। শিম একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি। শিম বা ফল সবজি হিসাবে রান্না এবং ভর্তা করে খাওয়া হয়। এর বীজ পুষ্টিকর সবজি বা ডাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।


চিত্র: শিম দিয়ে মাছ


চিত্র: শিম দিয়ে আলু ভাজি


চিত্র: শিমের বিচি দিয়ে ডিম রান্না


চিত্র: বিভিন্ন সবজির সাথে শীম

বৈজ্ঞানিক নাম: *Lablab purpureus.*

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম শিমে আছে পানি ৮৫ গ্রাম, আমিষ ৩.৮ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৮.০ গ্রাম, আঁশ ১.৮ গ্রাম, ফ্যাট ০.৭ গ্রাম, শক্তি ৪৮ কিলোক্যালরি, ক্যারোটিন ৩১২ আইইউ, থায়ামিন ০.১ গ্রাম, রাইবোফ্লাভিন ০.০৬ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন "সি" ৯.১ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ২১০ মিলিগ্রাম এবং আয়রন ১.৭ মিলিগ্রাম।

উৎপত্তি: এশিয়া মহাদেশের ভারত হচ্ছে শিমের উৎপত্তিস্থল।

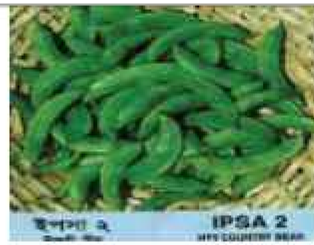
জলবায়ু ও মাটি: শিমের অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুসহ দীর্ঘ দিবসের প্রয়োজন। আবার ছোট দিবস ও শীত না পড়লে শিমের পুষ্পধারণ সম্ভব হয় না। এ জন্য তাপ ও দিবস নিরপেক্ষ জাত হলে বছরের যে কোন সময় বীজ বপন/ রোপণ করলে ফুল-ফল ধারণ করবে। সব ধরনের মাটিতেই শিম চাষ হয়। তবে সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযোগী।


চিত্র: মাঠে শীম চাষ

বীজ বপন/ চারা রোপণ মৌসুম: আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বীজ বপণের উপযুক্ত সময়।

জাত পরিচিতি: বাংলাদেশে প্রায় ৫০ টিরও বেশি স্থানীয় শিমের জাত আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য স্থানীয় জাতগুলো হলো: পুটি শিম, সীতাকুন্ডু, নলডক, হাতিকান, বাইনতারা, চ্যাপটা শিম,ধলা শিম ইত্যাদি।

আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতসমুহ হলো: বাবি শিম-১, ২. ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ইপসা শিম-১, ২, বিইউ শিম-৩, ইত্যাদি।

 চিত্র: বারি শিম-১	 চিত্র: বারি শিম-২	 চিত্র: বারি শিম-৫
 চিত্রঃ বিইউ শিম-৩	 চিত্রঃ ইপসা শিম-১	 চিত্রঃ ইপসা শিম-২

বীজ বপনের সময়

১) শীতকালীন: জুন- জুলাই

২) গ্রীষ্মকালীন: বছরের যে কোন সময়

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: বর্ষাকালে যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তাহলে মাদায় বপনকৃত বীজ পচে যেতে পারে। চারা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে এ সময় বাড়ির নিরাপদ স্থানে পলিব্যাগে চারা তৈরী করে নিতে হবে। জুলাই- আগষ্ট মাসে পলিব্যাগে উৎপাদিত ১০-১৫ দিন বয়সী চারা মূল জমির মাদায় রোপণ করতে হবে।

বীজতলার চারার পরিচর্যা

১. রোদ বৃষ্টি হতে চারাকে রক্ষা করার জন্য বীজতলার উপর শেড দিতে হবে।

২. চারার প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে, তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে। পলিব্যাগের মাটির চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বীজ হার: প্রতি শতকে ৩০ গ্রাম (একরে ৩.০ কেজি) বীজ লাগে।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই-তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫-৩.০ সে.মি. গভীরে বপন করতে হয়। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দু'টি

সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায়। এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৩০ গ্রাম (হেক্টরে ৫-৭ কেজি) শিম বীজের প্রয়োজন হয়।

মাদা তৈরি: দেশী শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশপাশে, পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে সারি করে চাষ করা হলে ১ মিটার দূরত্বে সারি করে প্রতি সারিতে ৫০ সে.মি. পর পর ৪৫ সে.মি. লম্বা, ৪৫ সে.মি. চওড়া ও ৪৫ সে.মি. গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। বীজ বপনকালে বর্ষা থাকে, তাই মাদায় যাতে পানি না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমতল হতে মাদার ভরাট মাটি ৫ সে.মি. পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা: শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তা ছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে আলগা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাটতি হলে পানি সেচ দিতে হবে।

৪.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: ভাল ফলনের জন্য সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: প্রথমে ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে উঁচু মাদা তৈরি করে বীজ রোপণ বা চারা রোপণ করতে হবে। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বেড় ১৫-২৫ সে.মি. উঁচু এবং ২.৫ মিটার প্রশস্ত হলে ভাল হবে। জমি ও কাজের সুবিধার জন্য যত পারা যায় লম্বা করতে হবে। দুটি বেড়ের মাঝে ৫০ সে.মি. প্রশস্ত এবং ১৫-২৫ সে.মি. গভীর নালা রাখতে হয়। ২.৫ মিটার প্রশস্ত বেড়ের উভয় পার্শ্বে ৫০ সে.মি. করে বাদ দিয়ে ১.৫ মিটার দূরত্বে ৪০ সে.মিX৪০ সে.মিX৪০ সে.মি. সাইজের মাদাতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে তৈরি করে ফেলতে হবে। তবে ১ মিটার প্রস্থ বেড় ও একক সারি পদ্ধতিতে ১.০-১.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন/রোপণ করতে হবে। এ পদ্ধতিতে গাছের পরিচর্যা ও ফসল উত্তোলন সুবিধাজনক।



চিত্রঃ মাঠে শিম চাষ (মাচায়)

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: শিম ফসলের ক্ষেতে শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার, জিপসাম ও বোরিক এসিড জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ভালভাবে চাষ দিতে হবে। বীজ বপন ও চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া ও এমপি সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে মাদায় মাটির সাথে (১০ সে.মি. গভীর পর্যন্ত) ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বপন/চারা রোপণের ৩০ দিন

পর বাকী অর্ধেক ইউরিয়া সার ও এমপি সার মাদায় উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে প্রতি শতংশে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি তুলে ধরা হল।

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	বপন/রোপণের ৪-৫ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ	মাদায় উপরিপ্রয়োগ (বপন/রোপণের ৩০ দিন পর)
গোবর	৪০ কেজি	সব টুকু	-	-
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	-	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
টিএসপি	৩৫০ গ্রাম	-	সব টুকু	-
এমপি	২৫০ গ্রাম	-	১২৫ গ্রাম	১২৫ গ্রাম
জিপসাম (সালফার সার)	২০ গ্রাম	সব টুকু	-	-
বোরিক এসিড (বোরণ সার)	২০ গ্রাম	সব টুকু	-	-

৪.১.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরীর ৪-৫ দিন পর মাদায় বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে। বীজ সরাসরি মাদায় বপন করতে হবে। তবে পলিব্যাগে চারা তৈরী করে মাদায় রোপণ করা যায়। পলিব্যাগের ১০-১৫ দিন বয়সের চারা (২-৩ পাতা যুক্ত) মাদায় রোপণ করা উত্তম। কারণ শিমের চারার ডগা লতানো শুরু করলে রোপিত চারার অঙ্গজ বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়। বপনকৃত বীজ থেকে চারা বের হবার ৮-১০ দিনের মধ্যেই প্রতিটি মাদায় একটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৪.১.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): ৮-১০ দিনের মধ্যে যে সব চারা মারা যায়, সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

মাচা দেওয়া বা বাউনি দেওয়া: শিমের কাংখিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচা বা বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। গাছ যখন ১৫ থেকে ২০ সেমি লম্বা হবে তখন মাদার গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা মাটিতে পুঁতে বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। বাউনির অভাবে গাছের শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির ব্যাহত হয় ও ফলন কমে যায়।

আগাছা দমন: মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাদার মাটি আলগা করে দিতে হবে।

শাখা ছাঁটাই: পুরানো ও মরা শাখা, ডগা ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ডগার প্যাঁচ খোলা: শিমের ডগা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কমাতে ও বেশি ফুল ধরাতে জড়াজড়ি করে থাকা ডগাগুলোর প্যাঁচ মুক্ত করে দিতে হবে।

সেচ ও পানি নিকাশ: কোন অবস্থাতেই গাছের গোড়ায় পানি যাতে না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে প্রয়োজনমতো সেচ দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক) পোকামাকড়

১) শিমের জাব পোকা

লক্ষণ: জাব পোকা পোকা গাছের কঁচি পাতা ও ডগার রস শুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফেলে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১) হাত দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলা।
২) আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করা।
৩) প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা।
৪) পরভোজী পোকা লালন করা যেমন: লেডিবার্ডবিটল।
৫) ডিটারজেন্ট পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।
৬) পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা ডায়মেথিয়ন নামক কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।



চিত্র: শিমে জাব পোকার আক্রমণ

২) শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা (Pod borer)

লক্ষণ: এ পোকা ফলে ঢুকে বীজ ও শিম খেয়ে নষ্ট করে দেয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১) এ পোকা দমনের জন্য আক্রান্ত ফল তুলে ধ্বংস করতে হবে।
২) তাছাড়াও রিপকর্ড নামক কীটনাশক ১ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।



চিত্র: শিমে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ

খ) রোগবালাই: শিমের বিভিন্ন রোগবালাই আক্রমণ করে থাকে:

১) **এনথ্রাকনোজ রোগ:** এ রোগ ছত্রাক জনিত।

লক্ষণ: এ রোগ আক্রান্ত গাছের পাতা, কান্ড ও শিম প্রথমে বাদামী রং এর পঁচা ক্ষত দেখা যায়। পরে তা বেড়ে গিয়ে গাছ ও ফল নষ্ট করে দেয়।

দমন ব্যাবস্থাপনা

১) রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা।

২) বীজ লাগানোর আগে প্রোভ্যাক্স প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করা।

৩) এই রোগ দমনের জন্য ডায়াথেন এম-৪৫ বা টপসিন এম ০.২% দ্রবণ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।



চিত্র: এনথ্রাকনোজ রোগ

২) হলুদ মোজাইক রোগ: ভাইরাসের জন্য এই রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ: এ রোগ পাতায় আক্রমণ করে। পাতা হলুদ ও সবুজ রং এর মোজাইক দেখা দেয়।

দমন ব্যাবস্থাপনা

১) এই রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ নষ্ট করে এ রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

২) যেহেতু বীজের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় সেজন্য আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ না করে সুস্থ ফসল থেকে বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার করে এ রোগের আক্রমণ বন্ধ করা যায়।

৩) জাব পোকা এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।



চিত্র: হলুদ মোজাইক রোগ

৪.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতার নির্ধারণ: ফুল ফোটার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে শিম তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। জাতভেদে বীজ বোনার ৯৫ থেকে ১৪৫ দিন পর শিম তোলা যায়। সবজি হিসাবে বীজ শক্ত হবার আগেই শিম সংগ্রহ করতে হয়। শিমের বীজও ভাল সবজি। তাই বীজ শক্ত হলেও সংগ্রহ করা যায়।

শিম সংগ্রহ: জাতভেদে বীজ বোনার ৯৫ থেকে ১৪৫ দিন পর শিম তোলা যায়। ৫-৭ দিন অন্তর উঠালে মোট ১৩-১৪ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। শিম গাছ ৪ মাসের বেশি সময় ধরে ফল দেয়।

শিমের বাজারজাতকরণ: প্রতিবার শিম তোলার পর বাজারে নিতে হবে। শিমের কাঁচা ও শুকনা শুঁটির চাহিদাও প্রচুর। এগুলো সংগ্রহ করে বাজারে নিলে ভালো দাম পাওয়া যায়।

শিমের ফলন: প্রতিশতকে ৬০ থেকে ৮০ কেজি।

৪.২ বরবটি (Yardlong Bean)



বরবটি বাংলাদেশের খরিপ মৌসুমের একটি জনপ্রিয় সবজি। এর ফল জাতভেদে প্রায় আধা গজ লম্বা হয়। বরবটি সবজি হিসাবে দেশের সবত্র বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়িতে চাষ হচ্ছে।

৪.২.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার: বরবটি একটি লতানো স্বভাবের একবর্ষী গুল্ম প্রকৃতির গাছ। জাতভেদে ফলের রং সবুজ, সাদা ও মেরুন হয়। বরবটি একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি। কচি ফল কাঁচা খাওয়া হয় ও সবজি হিসাবে রান্না করে খাওয়া হয়। সালাদ হিসাবেও কাঁচা বরবটি খাওয়ার রেওয়াজ আছে। কুচি কুচি করে

বরবটি কেটে তা ডিমের সাথে মেখে ওমলেট ভেজে খাওয়া হয়। এ ছাড়া বেসনে মিশিয়ে বড়া ভাজা হয়। বরবটি কেবল সবজিই নয়, পশুখাদ্য ও সবুজ সার হিসাবে এর ব্যবহার ব্যাপক।


চিত্র: আলু বরবটি ভাজি


চিত্র: মাছ দিয়ে বরবটি


চিত্র: বরবটি ভাজি


চিত্র: বরবটি দিয়ে চিংড়ি

বৈজ্ঞানিক নাম: বরবটির বৈজ্ঞানিক নাম *Vigna unguiculata.*

পুষ্টিমান: বরবটির প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যাংশে আছে পানি ৮৬ গ্রাম, শক্তি ৫০ কিলোক্যালরি, আমিষ ৩.৫ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৮.০০ গ্রাম, ফ্যাট ০.২ গ্রাম, ক্যারোটিন ৭৬০ আইঃইউঃ, থায়ামিন ০.১২ গ্রাম, রাইবোফ্লাভিন ০.১৫ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ১.১৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন "সি" ১৬ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৮০ মিলিগ্রাম এবং আয়রন ১.২ মিলিগ্রাম।

উৎপত্তি: বরবটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে চীন।

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বরবটি ভালো জন্মে। ২০-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বরবটি ভালো হয়। দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি বরবটি চাষের জন্য উপযোগী। বরবটি চাষের জন্য মাটির অনুকুল পিএইচ হলো ৫.৫ থেকে ৭.৫।

জাত পরিচিতি: বরবটির জাত সমুহ হলোঃ ঘৃতকুমারী, গ্রীন লং, চীনা বরবটি, লাল বেনী, তকী, বনলতা ইত্যাদি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক "বারি বরবটি-১" নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছেন। এই জাতটি গাঢ় সবুজ ও উচ্চফলনশীল। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করোরেশন (BADC) কতৃক উদ্ভাবিত "কেগরনাটকী' জাতটি এদেশে ভীষণ জনপ্রিয়।

বীজ বপনে সময়: বরবটির বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ফেব্রয়ারী থেকে জুলাই মাস। তবে মার্চ- এপ্রিল মাস বীজ বপনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। শীতকালে বরবটির বীজ বোনা উচিৎ নয়।

বীজ শোধন: বরবটির বীজ বপনের আগে কার্বেন্ডাজিম বা থিরাম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে ছত্রাক ঘটিত রোগের আক্রমণ কমে যায়।

বীজ হার: ৪০ গ্রাম/ শতক।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন:

মাদা তৈরি: বরবটির জন্য দুই পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষাবাদ করা যায়। একটি হচ্ছে বীজতলায় বা পলিব্যাগে চারা উৎপাদন এবং আরেকটি সারিতে মাদা করে বীজ বপন। সারিতে মাদা করে সরাসরি বীজ বপন করা যায়। সারি পদ্ধতিতে ৩০ সে.মি. দূরে দূরে বীজ লাগাতে হবে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সে.মি। এখানে ৬০ দিন পর্যন্ত নিয়মিত পানি দিতে হবে।

বেড তৈরি: মাটি থেকে ১৫-২০ সে.মি উচু করে ১ মি. চওড়া ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা করে বেড তৈরি করতে হবে। ২০ সে.মি. গভীর করে ৫০ সে.মি প্রস্থের নালা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে সারি হবে দুইটি এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছ এর দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি.।



চিত্র: পলিব্যাগে বরবটির চারা

৪.১.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সুর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: প্রায় সব ধরনের মাটিতে বরবটি চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে বরবটির চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: বরবটি চাষের জন্য জমি হতে হবে আগাছা মুক্ত ও ঝুরঝুরে মাটি। এর জন্য জমি ভালোভাবে কয়েকবার চাষ দিতে হবে। জমি পরিষ্কার করে ৪ থেকে ৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। তারপর মাটির উপরে বেড ও মাদায় তৈরি করে প্রত্যেক মাদায় ৪-৫ টি বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে সারি হতে সারির দূরত্ব হতে হবে ৬০ সে.মি. এবং মাদা হতে মাদার দূরত্ব হতে হবে ৩০ সে.মি.। একই সময় পলিব্যাগে কিছু চারা তৈরি করে রাখলে যেসব জায়গায় বীজ গজাবে না, সেসব ফাঁকা জায়গায় পলিব্যাগের উৎপাদিত চারা রোপণ করে শূন্য স্থান পুরণ করা যাবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১০ কেজি (শতকে ৪০ গ্রাম) বীজ লাগে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: বরবটির জন্য নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার, জিপসাম ও বোরণ জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। বীজ বপনের বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া এবং পটাশ সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে মাদায় মাটির সাথে (১০ সেমি গভীর পর্যন্ত) কোদালের সাহায্যে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এবং এমপি সারের বাকি অর্ধেক বীজ লাগানোর ৩০ দিন পর বেডে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে কোদাল দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বরবটি ডালজাতীয় ফসল বলে নাইট্রোজেন জনিত সার কম লাগবে।

নিম্নে শতাংশ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি দেখানো হল:

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	বপন/রোপণের ৪-৫ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ	বপনের ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ
গোবর	৬০ কেজি	সব	-	-

ইউরিয়া	২০০ গ্রাম	-	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০০ গ্রাম	-	-	-
এমপি	৬০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
জিপসাম (সালফার সার)	৪০০ গ্রাম	সব	-	-
জিংক সালফেট	৫০ গ্রাম	সব	-	-
বোরাক্স	৪০ গ্রাম	সব	-	-

৪.২.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

সারি পদ্ধতিতে ২.৫-৫ সে.মি. গভীরতায় বীজ বপন করতে হবে। বীজ বোনার ২০-৩০ দিন পর্যন্ত বরবটির জমিতে আগাছা জন্মাতে দেয়া যাবে না।

৪.২.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

মাচা দেওয়া বা বাউনি দেওয়া: বরবটির জন্য বাউনি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। চারা বড় হলে মাচা বা বাউনি দিতে হবে। প্রতি বেডের ঠিক মাঝখানে বা বরবটির দুটি সারির মাঝে বেড়ের দুপাশে ১.৫ মিটার লম্বা দুটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার মাথায় শক্ত জিআই তার টেনে বাউনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সারিতে প্রতি দুইটি বরবটি গাছের মাঝে একটি করে কাঠি বা বাশের কঞ্চিতে জিআই তারের সাথে ইংরেজি ‘এ” অক্ষরের মতো বেঁধে তার সাথে গাছ লতিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বরবটির লতা যত মুক্তভাবে বাইতে পারে ফলনও তত বেশি হয়।

আগাছা দমন ও নিড়ানী বৃষ্টির পানি যাতে আটকে না থাকে সেজন্য নালার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। বরবটির গাছ বড় হলে মাচা তৈরি করে দিতে হবে।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: বেডের দুই পাশের নালা দিয়ে বরবটির জমির সব জায়গায় সমান ভাবে পানি সেচ দেয়া বা অতিরিক্ত সেচ বা বৃষ্টির পানি সহজেই বের করা যায়। ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। সেচের পরপরই জমে থাকা পানি সরিয়ে দিতে হবে। জমিতে মাটির অবস্থা বুঝে মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকতে দেওয়া যাবে না।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক) পোকামাকড়

১) বরবটির জাব পোকা (Aphid)

লক্ষণঃ গাছের পাতা ও কচি ডগার রস শোষণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১) হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করা

২০২৫

২) এ পোকা দমনের জন্য ফাইফানন -৫৭ ইসি ২.৫ মি.লি./ ১ লিটার হারে পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।



চিত্র: বরবটির গাছে জাব পোকার আক্রমণ

২) বরবটির ফল ছিদ্রকারী পোকা (Pod borer)

লক্ষণ: এ পোকার কীড়া গাছের কান্ড, মুকুল এবং ফল ছিদ্র করে দেয় এবং আক্রান্ত ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য ফসলের মাঠে পর্যায়ক্রমে ট্রাইকোগামা ও ব্রাকন বোলতা ছাড়া যায়। এসব বোলতা ফল ছিদ্রকারী পোকাদের পরজীবীতার মাধ্যমে মেরে ফেলে।

২. প্রতিকারের জন্য ১ মিলি রিপকর্ড ১০ ইসি কীটনাশক ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।



চিত্র: ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত বরবটি

খ) রোগবালাই

১) **এনথ্রাকনোজ রোগ:** এটি ছত্রাকজনিত রোগ।

লক্ষণ: এ রোগ আক্রান্ত গাছের পাতা, কান্ড ও ফলে প্রথমে বাদামী রং এর পঁচা ক্ষত দেখা যায়। পরে তা বেড়ে গিয়ে গাছ ও ফল নষ্ট করে দেয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগটি বীজবাহিত ছত্রাক। তাই ১ কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে বীজ বপন করতে হয়।

২. রোগ দমনের জন্য ডায়াথেন এম-৪৫ বা টপসিন এম ০.২% দ্রবণ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।



চিত্র: এনথ্রাকনোজ রোগ

৪.১.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতার নির্ধারণ: বরবটি কচি অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। যখন দেখা যাবে ফলে বীজ গঠিত হয়েছে কিন্তু বীজ পুষ্ট ও পরিপূর্ণ ভাবে বড় হয়নি, খোসার রং স্বাভাবিক সবুজ আছে, হলুদাভ বা ফিকে সবুজ হয়নি, বরবটি খোসা মসৃন আছে, বীজ ফুলে যাওয়া ও কুঁচকানো হয়নি এরূপ অবস্থায় বরবটি তুলতে হবে।

বরবটি সংগ্রহ: জাতভেদে বীজ বপনের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর বরবটি তোলা শুরু করা যায়। ছুরি দিয়ে বোঁটা কেটে বরবটি তোলা ভালো। এতে গাছের ক্ষতি কম হয়।

বরবটি বাজারজাতকরণ: প্রতিবার বরবটি তোলার পর বাজারে নিতে হবে। সংগ্রহ করা ফসল আঁটি বেঁধে বাজারে বিক্রির জন্য নিতে হবে। সাধারণত আধা কেজি থেকে ১ কেজির আঁটি করা হয়। আঁটি বাঁধার সময় পোকাক্রান্ত, বিকৃত, রোগগ্রস্ত বরবটি বাদ দিতে হবে। মোটামুটি একই রকম লম্বা চেহারার বরবটি একসাথে আঁটি বাঁধলে তার বাজারদর ভালো পাওয়া যায়।

ফলনঃ বরবটির ফলন প্রতি শতকে ৬৫ থেকে ৭০ কেজি।

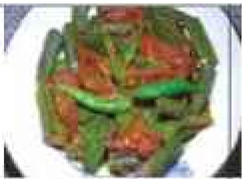
৪.৩ ঢেঁড়স (Okra/Lady's Finger)

গ্রীষ্মকালীন সবজি হিসাবে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের লোকের কাছে ঢেঁড়স খুবই জনপ্রিয়। ঢেঁড়স এর অন্য নাম ভেন্ডি। ঢেঁড়স বাংলাদেশের গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের একটি অন্যতম প্রধান সবজি।

৪.৩.১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

সবজির পরিচিতি ও ব্যবহার:

ঢেঁড়স একটি বর্ষজীবী বিরুৎ প্রকৃতির গাছ। আমাদের দেশে মূলত ভাজি, ভর্তা ও রান্নায় তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঢেঁড়স কাটলে পিচ্ছিল পদার্থ বের হয়, রান্নার পর তা আর থাকে না। মাছ ও নুডলসের সাথেও খাওয়া যায়। তাছাড়া কচি ঢেঁড়স সিদ্ধ করে টমেটোর সাথে সালাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

 **চিত্র: ঢেড়ঁস টমেটোর তরকারি**	 **চিত্র: ঢেড়ঁসের সাথে কিমা**	 **চিত্র: ঢেড়ঁস ভাজি**	 **চিত্র: ঢেড়ঁসের সালাদ**

বৈজ্ঞানিক নাম: ঢেড়ঁসের বৈজ্ঞানিক নাম *Abelmoschus esculentus.*

পুষ্টিমান: ঢেড়ঁসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এবং এ ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন, ভিটামিন এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। ঢেড়ঁস নিয়মিত খেলে গলাফোলা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং এটা হজম শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। প্রতি ১০০ গ্রাম ঢেড়ঁসের খাদ্যাংশে আছে ৯০.১৭ গ্রাম পানি, ৩৩ কিলো ক্যালরি শক্তি, ২০০ গ্রাম প্রোটিন, ০.১৯ গ্রাম চর্বি, ৭.৪৫ গ্রাম শ্বেতসার, ১.৪৮ গ্রাম চিনি, ৩৬ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন 'এ', ০২ মিলিগ্রাম থায়ামিন, ০.০৬ মিলিগ্রাম রিবোফ্লাবিন, ১.০ মিলিগ্রাম নায়াসিন, ৮২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ০.৫৮ মিলিগ্রাম জিংক।

উৎপত্তি: দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকার কোন এক স্থানে ঢেড়ঁসের উৎপত্তি।

জলবায়ু ও মাটি: ঢেড়ঁসের জন্য অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রার প্রয়োজন। শুষ্ক ও আঁদ্র উভয় অবস্থায় ঢেড়ঁস জন্মানো যায়। তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নিচে গেলে বৃদ্ধির হার কমে যায়। দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি ঢেড়ঁস চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। জমি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল হওয়া আবশ্যক।

উৎপাদন মৌসুম: খরিপ মৌসুম।

জাত পরিচিতি: ঢেড়ঁসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জাতের মধ্যে রয়েছে যেমন- "বারি ঢেড়ঁস-১", "বারি ঢেড়ঁস-২", পুশা সাওয়ানি, পেন্টা গ্রীন, কাবুলি ডোয়ার্ফ, জাপানী প্যাসিফিক গ্রীন ইত্যাদি।

"বারি ঢেড়ঁস-১" এর বৈশিষ্ট্য:

১. কান্ড অনিয়মিতভাবে বাড়তে থাকে এবং প্রায় সব পত্রেই ফুল ও ফল ধরে।

২. গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা হয়।

৩. গাছ প্রতি ফলে সংখ্যা ২৫-৩০টি।

৪. বীজ বপনের ৪৫ দিনের মধ্যেই ফুল ফুটতে শুরু করে।

৫. ফল ৫ শিরা বিশিষ্ট, সবুজ এবং ১৪-১৮ সে.মি. লম্বা।

৬. ফুল ফোটার ৫-৬ দিনের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করতে হয়।

৭. পরিপক্ক এবং শুষ্ক বীজে বাদামী রোমশ আবরণ আছে যা এ জাতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।



চিত্রঃ "বারি ঢেঁড়স-১"

বীজ বপনে সময়: বাংলাদেশে সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ঢেঁড়সের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজ হার: ২০ গ্রাম/শতক। প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে।

বীজ শোধন: বীজ বাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন করা হয়। কেজি প্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স/ক্যাপটান জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: সাধারণত ঢেঁড়সের বীজ জমিতে সরাসরি লাইন টেনে অথবা বেড তৈরি করে সারিতে বীজ বপন করতে হয়। চারা অবস্থায় ঢেঁড়সে পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখো দেয়। উরচুঙ্গা (মোল ক্রিকেট) পোকা চারার গোড়া কেটে দেয়। এ জন্য কিছু অতিরিক্ত চারা পলিব্যাগে তৈরি করে রাখতে হবে। যাহাতে পরবর্তী গ্যাপ ফিলিং করা যায়।

৪.৩.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: পানি নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

মাটি নির্বাচন: দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে

জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি: বৃষ্টির পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ্র থাকে এমন জমি ঢেঁড়সের জন্য ভাল। ৫/৬ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাঠে সরাসরি বীজ বপনের জন্য ১ মিটার প্রস্থ বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপশি দুটি বেডের মাঝখানে ৩০ সে.মি. প্রস্থ নালা রাখতে হবে। বেড সাধারণত ১৫-২০ সে.মি. উঁচু হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সে.মি,।



চিত্রঃ ঢেঁড়স চাষে জমি প্রস্তুতকরণ ও বেড তৈরি

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: নিম্নে ঢেড়ঁস চাষে শতাংশ প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ দেখানো হলঃ

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	উপরি প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি (চারা রোপণের ৩০ দিন পর)	২য় কিস্তি (চারা রোপণের ৫০ দিন পর)	৩য় কিস্তি (চারা রোপণের ৮০ দিন পর)
গোবর	৫৭ কেজি	সবটুকু	-	-	-
ইউরিয়া	৬০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম
টিএসপি	৪০ গ্রাম	সবটুকু	-	-	-
এমওপি	৬০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম

৪.৩.৩ বীজ বপন/ চারা রোপণ

আগাম ফসলের জন্য বীজ ঘন করে বপন করতে হয়। সঠিক সময়ে ১ মিটার প্রস্থ বেড়ে ৬০ মে.মি.×৪০ সে.মি. দূরত্বে দু'সারিতে বীজ বপন করতে হয়। বীজ সাধারণত ২-৩ সে.মি.গভীরে বপন করতে হয়। এক সাথে ২টি বীজ বপন করা ভাল। বীজ বপন করার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। বীজ বপনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সেচ আবশ্যক। চারা গজানোর ৭ দিন পর সুস্থ সবল একটি গাছ যথাস্থানে রেখে অতিরিক্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

৪.৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলা: ঢেড়ঁসের বীজের অঙ্কুরোদগম অনিয়মিত। বীজ বপন করার সময় প্রতি গর্তে দুইটা বীজ দিতে হবে। দুটি বীজ যদি গজায় তবে ৪-৫ পাতা অবস্থায় সুস্থ সবল চারা রেখে অন্যটি তুলে ফেলতে হবে।

আগাছা দমন ও নিড়ানী: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার ও মাটির উপরিভাগ আলগা করে দিতে হবে।

সেচ ও পানি নিকাশ: শুস্ক আবহাওয়ায় মাটির প্রকারভেদ অনুযায়ী ১০-১২ দিন পর পর সেচ প্রয়োজন। প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। বর্ষাকালে গাছের বৃদ্ধি ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য ২৫-৩০ সে.মি. উঁচু করে বেড তৈরি করতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান তিন কিস্তিতে বীজ বপনের ৩০, ৫০ ও ৮০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ক) পোকামাকড়

১) ঢেড়ঁসে ফল ছিদ্রকারী পোকা: ঢেড়ঁসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে এই পোকা।

লক্ষণ: ডিম থেকে বাদামি রঙের কীড়া বের হয়ে ডগা বা কচি ফলে আক্রমণ করে। কীড়া ডগা ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে ভেতরের নরম অংশ কুরে কুরে খায়। আক্রান্ত ডগা নেতিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায় ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

২. ক্ষেত পরিস্কার রাখতে হবে।

৩. জৈব বালাইনাশক নিমবিসিডিন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৪. সিমবুশ/সিমফিল/রিপকর্ড ১ মিলি প্রতি লিটার পানির সথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।



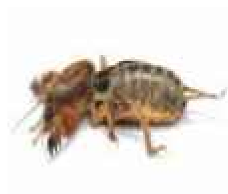
চিত্র: ঢেড়ঁসে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ

২) কাটুই পোকা/ উরচুঙ্গা (Mole cricket)

লক্ষণ: এ পোকা গাছের কান্ড বা গোড়া কেটে দিয়ে ক্ষতি সাধন করে। বিশেষ করে চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে।



চিত্র: কাটুই পোকার আক্রমণ



চিত্র: কাটুই পোকা/ উরচুঙ্গা

দমন ব্যাবস্থাপনা

১. প্রতিদিন ভোর বেলা খুঁজে খুঁজে কর্তিত কান্ডের গোড়ার মাটি খুঁড়ে পোকা ধরে মেরে ফেরতে হবে।

২. ডার্সবান বা সারফস ২০ ইসি ৫ মিলি কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।

খ) রোগবালাই:

১) হলুদ শিরা বা মোজাইক ভাইরাস রোগ: এই রোগটি ঢেড়ঁসের অন্যতম প্রধান শত্রু।

লক্ষণঃ ভাইরাস জনিত কারণে পাতা হলদে হয়ে কুচকে যায়। আক্রান্ত ফল ও হলুদ রং ধারণ করে।

দমন ব্যাবস্থাপনা

২. আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলা এবং নির্দিষ্ট একটি গর্তে আক্রান্ত গাছ মাটিচাপা দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা।

৩. পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি বা মেটাসিস্টক্স ২৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর স্প্রে করলে হোয়াইট ফ্লাই পোকার (বাহক পোকা) আক্রমণ কমে এবং এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম পরিলক্ষিত হয়।

৪. "বারি ঢেড়ঁস-১" জাতটি হলুদ শিরা ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই এই জাত ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০১৫

চিত্র: হলুদ শিরা বা মোজাইক ভাইরাস রোগ

৪.৩.৫ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

ফলের পরিপক্কতার নির্ধারণ: ফল ধারণের ৭-৮ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফলের বয়স ১০ দিনের বেশি হওয়া যাবে না। ১০ দিনের বেশি হলে ফল আঁশময় ও পুষ্টিমানের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট হয়ে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

ফসল সংগ্রহ: যত বেশি ফল সংগ্রহ করা যায় তত বেশি ফলন দেয়। ফুল ফোটার ৫/৬ দিন পর থেকেই ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতি একদিন অন্তর ফসল সংগ্রহ করতে হয়।



চিত্র: ফসল সংগ্রহ

বাজারজাতকরণ: সংগ্রহ করার পর দ্রুত বাজারজাতকরণ করতে হয়।

ফলন: প্রতি শতকে ফলন ৬০ থেকে ৬৫ কেজি।

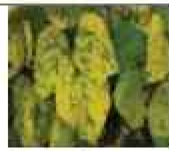
পাঠ সংক্ষেপ

১. শিম একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি।
২. কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন(BADC) কতৃক উদ্ভাবিত বরবটির “কেগরনাটকী’ জাতটি এদেশে ভিষণ জনপ্রিয়।
৩. বাউনিতে বরবটির লতা যত মুক্তভাবে বাইতে পারবে ফলনও তত বেশি হবে।
৪. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত “বারি ঢেড়ঁস -১” জাতটি ঢেড়ঁসের হলুদ শিরা রোগ প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল জাত হিসাবে পরিচিত।
৫. তাপ ও দিবস নিরপেক্ষ জাত হলে বছরের যে কোন সময় শিমের বীজ বপন/ রোপণ করলে ফুল-ফল ধারণ করবে।
৬. বরবটি ক্ষেতে প্রচুর রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়।

৭. উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়ায় বরবটি ভালো জন্মে।
৮. ঢেড়ঁসের ফল ধারণের ৭-৮ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়।
৯. ঢেড়ঁসের বীজের অঙ্কুরোদগম অনিয়মিত।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তোমরা শিম, বরবটি ও ঢেড়ঁশ চাষে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছো। নিম্নোক্ত ছকে কয়েকটি পোকা/রোগের আক্রান্ত ছবির নমুনা দেওয়া হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগ সনাক্ত করে ফসলের নাম ও দমনের উপায় লিখ।

ক্র/নং	ফসলের নাম	পোকা/রোগের নাম	ছবি দেখে উত্তর লিখ	দমনের উপায়
০১)				
০২)				
০৩)				
০৪)				
০৫)				
০৬)				

অনুসন্ধানমুলক প্রশ্ন

ইতিমধ্যে তুমি বরবটি চাষে বিভিন্ন প্রকার সার সম্পর্কে জেনেছো। তুমি তোমার বসতবাড়ীর পাশে ১ শতক জমিতে বরবটি চাষ করার পরিকল্পনা করেছো। তাই উক্ত জমিতে তুমি সফলভাবে বরবটি চাষ করতে বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং আন্ত:পরিচর্যা করবে সেই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ শিমের ২টি জাতের নাম লিখ।

১. কখন শিম চাষের উপযুক্ত সময়?

২. কত তাপমাত্রায় শিমের ফলন কমে যায়?

৩. শিমের কোন জাতটি সারা বছর চাষ করা যায়?

৪. শিম গাছ কত দিন ধরে ফল দেয়?

৫. ৩টি বরবটির জাতের নাম লিখ।

৬. কত তাপমাত্রায় বরবটি ভাল হয়?

৭. বরবটি ফসলে কোন সার কম দিতে হয়?

৮. বীজ বপনের কত দিন পর ফসল তোলা হয়?

৯. জাত ভেদে কি কি রংগের বরবটি দেখা যায়?

১০. ঢেড়ঁসের ২টি জাতের নাম লিখ।

১১. কখন ঢেড়ঁস চাষের উপযুক্ত সময়?

১২. কত তাপমাত্রায় ঢেড়ঁসের ফলন কমে যায়?

১৩. ঢেড়ঁসের কোন জাতটি হলুদ শিরা প্রতিরোধী?

১৪. কোন পোকা ঢেড়ঁসের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে?

১৫. ঢেড়ঁসের বয়স ১০ দিনের বেশি হলে কি হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১) শিম কোন ধরনের আবহাওয়ার এবং কী ধরনের মাটিতে ভালো হয়?

২) আধুনিক উচ্চফলনশীল জাতের শিমের নাম লিখ।

৩) "বারি ঢেড়ঁস-১" জাতের বৈশিষ্ট্য লিখ।

৪) শিমের জাব পোকা দমনের উপায় কী?

৫) বরবটির জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু ও মাটির বিবরণ দাও।

৬) বরবটির চাষে কোন জাতীয় সারের প্রয়োজন।

৭) বরবটি ফসলের পরিপক্কতার লক্ষণ কী?

৮) বরবটির জন্য বাউনী দেওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৯) ঢেড়ঁসে কোন ধরনের আবহাওয়ার এবং কি ধরণের মাটিতে ভালো হয়?

১০) ঢেঁড়সের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১) পিপিই বলতে কি বুঝায়?

১২) শিমের ফল ছিদ্রকারী পোকা কী ক্ষতি করে?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১ শিমের বেড তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি আলোচনা কর।

২ শিমের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৩ বরবটি চাষের মাদা তৈরি ও বেড তৈরি এবং সার প্রয়োগ পদ্ধতির বিবরণ দাও।

৪ বরবটি পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।

৫ বরবটির ক্ষেতের বাউনি দেওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৬ ঢেঁড়সের বেড তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি বিবরণ দাও।

৭ ঢেঁড়সের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।

জব ৪.১: শিম ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

- জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।
- বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।
- সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার পরিচর্যা করতে পারবে।
- সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার র্পূবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাবস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

শিম চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্রযুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। বাঁশে চটা ১২। জৈব ও রাসায়নিক সার ১৩। নিক্তি ১৪। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৫। খন্তা ১৬। টুকরি ১৭। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২) জুলাই-আগষ্ট মাসের মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ৩০-৪০ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৩) মূল জমিতে প্রতি শতকে ৪০ কেজি জৈব সার, ১.৫০ কেজি টিএসপি সার, ১.০০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

৪) শিম পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরূপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচের দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫) বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৬) প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও পটাশ সারের উপরিপ্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	মাদায় উপরিপ্রয়োগ (বপন/রোপণের ৩০ দিন পর)
ইউরিয়া	৫০ গ্রাম
এমওপি	১২৫ গ্রাম

৮) শিমের চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে / আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

৯) ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পুর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

১০) ফসল তোলার ১৫ দিন আগে থেকেই যে কোন ধরনের বালাইনাশক স্প্রে করা উচিত নয়।

১১) পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে জাতভেদে বীজ বপনের ৯৫ থেকে ১৪৫ দিন পর শিম সংগ্রহ করতে পারবে।

১২) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১. সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২. সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা

সফলতার সাথে শিম চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৯.২: বরবটি ফসলের চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন।

শিখনফল

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে পারবে।

২. বেড তৈরি, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।

৩. সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও চারার বাউনি তৈরী করতে পারবে।

৪. সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ ও সংগ্রহ করা;

৩. বালাইনাশক স্প্রে করার পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	১টি
২	এপ্রোন	প্রয়োজনমত	১টি
৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	১ জোড়া
৫	গামবুট	প্রয়োজনমত	১ জোড়া

২০২৫

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

বরবটি চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভাল। পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমি আলো-বাতাস ও রৌদ্র যুক্ত হওয়া দরকার। উর্বর দো-আঁশ মাটি উত্তম। বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। পর্যাপ্ত জৈব সার ও অনুমোদিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি ২। উন্নত জাতের বীজ বা চারা ৩। কোদাল ৪। লাঙ্গল ৫। মই ৬। নিড়ানী ৭। আঁচড়া ৮। খুটি ৯। রশি ১০। টেপ ১১। বাশেঁর কঞ্চি ১২। জৈব ও রাসায়নিক সার ১৩। নিক্তি ১৪। ঝুড়ি বা প্লাস্টিকের বাটি ১৫। খন্তা ১৬। টুকরি ১৭। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২) মার্চ- এপ্রিল মাস মধ্যে বপন সময় নির্ধারণ করে জাত নির্বাচন ও শতক প্রতি ৪০ গ্রাম (চারা রোপণের ক্ষেত্রে) বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৩) মূল জমিতে প্রতি শতকে ৬০ কেজি জৈব সার, ৬০০ গ্রাম টিএসপি সার, জিপসাম ৪০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৫০ গ্রাম, বোরাক্স ৪০ গ্রাম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

৪) বরবটি পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরূপ মাটি শুকিয়ে গেলে সেচের দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫) বৃষ্টিজনিত বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেড়ে আগাছা হলে সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৬) প্রতি শতক জমিতে নিম্নোক্তভাবে ইউরিয়া ও পটাশ সারের উপরিপ্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	মোট পরিমাণ	বপন/রোপণের ৪-৫ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ	বপনের ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ
ইউরিয়া	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
এমওপি	৬০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম

৮) বরবটির চারা পোকামাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমি সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে, প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত অংশ কেটে মাটির গর্তে পুতে/আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় বালাই দমনে কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

৯) ফসল সংগ্রহের ১ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

২০২৫

১০) ফসল তোলার ১৫ দিন আগে থেকেই যে কোন ধরনের বালাইনাশক স্প্রে করা উচিত নয়।

১১) পরিপক্কতার লক্ষণ দেখে জাতভেদে বীজ বপনের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর বরবটি সংগ্রহ শুরু করতে পারবে।

১২) প্রতিটি কাজ ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখে শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১) সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে জমিতে সমানভাবে পড়ে।

২) সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা

সফলতার সাথে বরবটি চাষ করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মাশরুম চাষ

(Mushroom Cultivation)





আমরা দেশের গ্রামাঞ্চলে বাড়ির আনাচে-কানাচে ছায়াযুক্ত স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ছাতার আকৃতির সাদা রংয়ের এক ধরনের ছত্রাক জন্মাতে দেখি। একে আমরা ব্যাঙের ছাতা বলে অভিহিত করে থাকি। এক সময় মাশরুমকে ব্যাঙের ছাতা বলে কত হাসাহাসিই না করেছি। সেই মাশরুম আজ বাংলাদেশের একটি অর্থকরী সবজি। বর্তমানে দেশে প্রায় ৪০-৪২ হাজার মে.টন মাশরুম উৎপাদন হচ্ছে যার অধিকাংশই ওয়েস্টার মাশরুম। মাশরুম ব্যাঙের ছাতার মতো এক ধরণের ছত্রাক জাতীয় নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদ। মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতা দেখতে একই রকম হলেও এদের মাঝে অনেক পার্থক্য। একইরূপ দেখতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে যে ছত্রাক উৎপাদিত হয়, তা হলো মাশরুম যা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং বর্তমান বিশ্বে সবজি হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। যে কোন সবজির চেয়ে এর খাদ্যগুণ অনেক বেশি। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন আছে। মাশরুমের চাষ এবং এর ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও তেমন প্রসার ঘটেনি। চলো আমরা মাশরুমের গুণাগুণ ও উপকারিতা, চাষ পদ্ধতি, ব্যবহার ইত্যাদি জেনে নেই এবং চেষ্টা করি মাশরুমকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিতে।

এই অধ্যায় শেষে-

- বিভিন্ন মাশরুমের পরিচিতি এবং ব্যবহার বর্ননা করতে পারবে
- মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণ ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মাশরুম চাষের উপযোগী ঘর ও তাক তৈরি করতে পারবে
- মাশরুমের স্পন প্যাকেট (বীজ) সংগ্রহ, কর্তন ও স্থাপন করতে পারবে
- অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- রোগবালাই দমন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে

৫ মাশরুম চাষ

৫.১ মাশরুম পরিচিতি

ছত্রাক এর বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে। যার মধ্যে কিছু প্রজাতির ছত্রাক খাদ্য হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এমন ছত্রাক এর নামই হচ্ছে মাশরুম। ভলভেরিলা *(volvariella)*,প্লিওরেটাস *(pleurotus)*, এগারিকাস *(Agaricus)* ইত্যাদি মাশরুম খাদ্য হিসেবে খাওয়া হয়। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মুখরোচক খাবার হিসেবে মাশরুম গ্রহণ করে আসছে এবং বর্তমান বিশ্বে সব দেশের মানুষই মাশরুম খেয়ে থাকেন। লক্ষ্যনীয়, উন্নত দেশগুলোর মানুষই বেশি পরিমাণে মাশরুম খেয়ে থাকেন। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ খাবার হিসেবে মাশরুমের কথা উল্লেখ আছে। স্বাদ, পুষ্টি, ও ঔষধিগুণের কারণে ইতোমধ্যেই এটি সারা দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাশরুম চাষ হচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা মাশরুম চাষ করছেন। কিছু ক্ষেত্রে গৃহিনীরাও চাষ করছেন। অর্থাৎ আমাদের দেশে ঘরোয়া এবং বানিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করা হচ্ছে।

৫.১.১ মাশরুম কী?

মাশরুম হলো খাবার উপযোগী মৃতজীবি ছত্রাকের ফলন্ত অংগ যা অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ঔষধিগুণসম্পন্ন। বর্তমান ছত্রাকবিদরা বিশ্বে প্রায় ২ লক্ষাধিক প্রজাতির ছত্রাক চিহ্নিত করেছেন। এ অসংখ্য ছত্রাকের মধ্য থেকে দীর্ঘ যাচাই ও বাছাই করে যে সমস্ত ছত্রাক সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সে সমস্ত ছত্রাকসমূহকে তাঁরা মাশরুম হিসেবে গণ্য করেছেন । অন্যদিকে প্রাকৃতিক ভাবে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা ছত্রাক হল ব্যাঙের ছাতা যা সাধারণত খাওয়ার উপযোগী নয় বরং বিষাক্ত।



চিত্র: ব্যাঙের ছাতা



চিত্র: মাশরুম

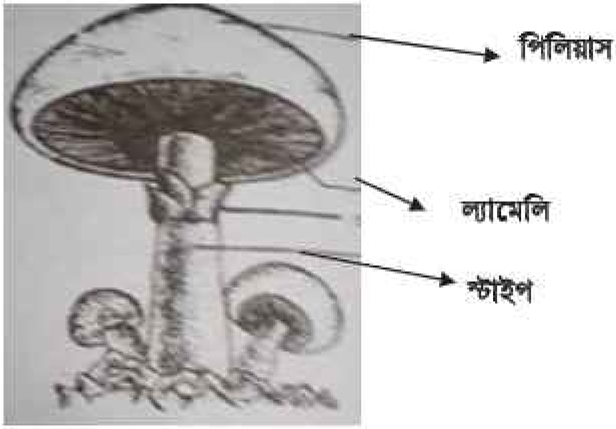
মাশরুমের সাধারণ গঠন : মাশরুমের দেহ দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত

১। অঙ্গজ মাইসেলিয়াম

২। ফ্রুটিংবডি।

মাশরুমের ফ্রুটিংবডি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১) টুপি (Cap) বা পিলিয়াস (Pileus): পরিণত মাশরুমের ডাঁটার ওপর যে অংশ ছাতার মতো দেখায় তাকে মাশরুমের টুপি বা পিলিয়াস বলে। সাধারণত এই অংশটি মাংসল (Fleshy) এবং মাশরুমের প্রধান ভোজ্য অংশরূপে ব্যবহার হয়।

২) স্টাইপ (Stipe) বা ডাঁটা (Stalk): একটি সাধারণ মাশরুমে স্টাইপ বা ডাঁটা সাধারণত দন্ডাকৃতি হয়। সাধারণভাবে ডাঁটার নিচের অংশ টুপির সংযোগস্থল থেকে ক্রমশ সরু হয়। কিন্তু বিভিন্ন মাশরুমের ডাঁটা বিভিন্ন আকৃতির হয়।



মাশরুমের সাধারণ গঠন

৫.১.২ বিভিন্ন ধরণের মাশরুমের পরিচিতি ও ব্যবহার

বাংলাদেশে চাষকৃত মাশরুম: বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে বানিজ্যিকভাবে ০৭ ধরণের মাশরুম চাষ হচ্ছে। মাশরুম গুলো হলো-

ক) ওয়েস্টার মাশরুম: সারা বছর চাষযোগ্য মাশরুম। অনেক পুষ্টি ও ঔষধিগুণসম্পন্ন । চাষ পদ্ধতি সহজ ও বসতবাড়িতে উৎপাদন করা যায়। দেশের বাজারে চাহিদা অনেক। ব্যাপক চাষ বৃদ্ধির সুযোগ আছে।

খ) ঋষি মাশরুম: গরমকালে চাষযোগ্য ঔষধি মাশরুম। সম্প্রতি এর উৎপাদন ও ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ) মিল্কি মাশরুম: গরমকালে চাষযোগ্য সবজি মাশরুম। অতি গরমেও চাষ করা যায়। সংরক্ষণকাল ও বাজার মূল্য বেশি।

ঘ) বাটন মাশরুম: বাটন বিশ্বের নামকরা মাশরুম। এ মাশরুম চাষের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা এবং একই সাথে উচ্চ আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে শীতকালে আংশিক নিয়ন্ত্রিত (Semi control) পরিবেশে এ মাশরুম চাষ করা যায়। তবে, সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত (Total control) পরিবেশে সারা বছর চাষ করা যায়। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে বাটন মাশরুম বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঙ) শীতাকে মাশরুম: শীতকালে চাষযোগ্য উচ্চ ঔষধিগুণসম্পন্ন সবজি মাশরুম। শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বিশ্বে শুকনো শীতাকে মাশরুমের চাহিদা ভাল। বাংলাদেশের বাজারে তাজা শীতাকের চাহিদা অনেক।

চ) স্ট্র মাশরুম: গরম কালে চাষযোগ্য উত্তম স্বাদের মাশরুম। খুবই অল্প সময়ে এ মাশরুম বসত বড়িতে উৎপাদন করা যায়। সংরক্ষণকাল কম।

ছ) কান মাশরুম: সারা বছর চাষযোগ্য উচ্চ ঔষধিগুণসম্পন্ন সজি মাশরুম। পাহাড়ী এলাকায় চাহিদা ভাল।


ওয়েস্টার মাশরুম


মিল্কি মাশরুম


ঋষি মাশরুম


স্ট্র মাশরুম


কান মাশরুম


বাটন মাশরুম



শীতাকে মাশরুম

চিত্র: বিভিন্ন ধরনের মাশরুম

৫.১.৩ মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণ

পুষ্টি বিচারে মাশরুম নিঃসন্দেহে সবার সেরা। কারণ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার অতি প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন- প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস এর পরিমাণ খুব বেশি । অন্যদিকে যেসব খাদ্য উপাদানের আধিক্য আমাদেরকে জটিল মরণব্যধির দিকে নিয়ে যায়, যেমন - ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট তা মাশরুমে নেই বললেই চলে। মাশরুমের প্রোটিন হল অত্যন্ত উন্নত, এবং উঁচুমানের কারণ মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় ৯টি এমাইনো এসিডের সবগুলোই মাশরুমে আছে। প্রাণীজ আমিষ যেমন- মাংস ও ডিমের আমিষ উন্নত ও সর্ম্পূণ হলেও তার সঙ্গে কোলস্টেরেল সমস্যা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে মাশরুমে চর্বি ও কার্বোহাইড্রেটের নিম্ন উপস্থিতি এবং কোলস্টেরল ভাঙ্গার উপাদান থাকায় শরীরে কোলস্টেরল জমার ভয় থাকে না। এ কারণে প্রোটিনের অন্যান্য সব উৎসের তুলনায় মাশরুমের প্রোটিন উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ । মাশরুমে ভিটামিন বি-১২ আছে প্রচুর পরিমাণে যা অন্য কোন উদ্ভিজ্জ উৎসে নেই।

বিভিন্ন মাশরুমের পুষ্টি মূল্য (প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুম)

মাশরুমের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	ফ্যাট (গ্রাম)	ফাইবার (গ্রাম)	শক্তি (কিলো ক্যালরি)
ওয়েস্টার	৩০.৪০	৫৭.৬০	২.২০	৮.৭০	২৬৫
মিল্কি	১৭.৬৯	৬৪.২৬	৪.১০	৩.৪০	৩৯১
স্ট্র	৩৭.৫০	৫৪.৮০	২.৬০	৫.৫০	৩০৫
কান	৪.২০	৮২.৮০	৮.৩০	১৯.৮০	৩৫১

২০২৫

শীতাকে	৩২.৯৩	৪৭.৬০	৩.৭৩	২৮.৮০	৩৮৭
বাটন	৩৩.৪৮	৪৬.১৭	৩.১০	২০.৯০	৪৯৯

(উৎস: মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট)

মাশরুম স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী — নিয়মিত খেলে মাশরুম ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন করে; ক্যান্সার, জন্ডিস ইত্যাদি প্রতিরোধ করে; হৃদরোগ, টিউমার, যৌন অক্ষমতা, রক্তস্বল্পতা ও মেদভুরি ইত্যাদি প্রতিরোধ ও নিরাময় করে; হাড় ও দাঁত শক্ত করে এবং চুল পাকা ও চুল পড়া রোধ করে। এছাড়া-

১। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: মাশরুমে উচ্চমাত্রার আঁশ থাকে, সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এছাড়া মাশরুমে কোলেস্টেরল কমানোর বিশেষ উপাদান এবং ভিটামিন বি, সি ও ডি থাকায় নিয়মিত মাশরুম খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ নিরাময় হয়।

২। ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে: মাশরুমের ফাইবার বা আঁশ পাকস্থলি দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখতে সাহায্য করে। মাশরুম রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ওজন কমাতে সহায়তা করে।

৩। ত্বক সুস্থ রাখে: মাশরুমে নিয়াসিন ও রিবোফ্লাবিন থাকে যা ত্বকের জন্য উপকারী। ৮০-৯০ ভাগ পানি থাকে যা ত্বককে নরম ও কোমল রাখে।

৪। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হলো আমাদের শরীরের সুস্থ্যতা ও যৌবন ধরে রাখার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। মাশরুমে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এই অত্যাবশ্যকীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো মারাত্মক কিছু রোগ, যেমন- স্ট্রোক, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ এবং ক্যান্সার থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

৫। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: এটি মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শীতাকে মাশরুম দৈনন্দিন কিছু অসুখ যেমন- কফ ও ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে।

৬। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে: ক্যান্সার ও টিউমার প্রতিরোধে মাশরুম বেশ উপকারী।

৭। স্নায়ুতন্ত্র: মাশরুমের ভিটামিন বি স্নায়ুর জন্য উপকারী এবং বয়সজনিত রোগ যেমন- আলঝেইমার্স রোগ থেকে রক্ষা করে।

৮। ডায়াবেটিস: মাশরুম গ্রহণ করলে রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। মাশরুমে এনজাইম ও প্রাকৃতিক ইনসুলিন থাকে যা চিনিকে ভেঙ্গে হজম করে।

৯। পরিপাক: এতে থাকা ফাইবার ও এনজাইম হজমে সহায়তা করে। এটি অন্ত্রে উপকারি ব্যাকটেরিয়ার কাজ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং কোলন এর পুষ্টি উপাদান শোষণকেও বাড়তে সাহায্য করে।

১০। হাড় ও দাঁত মজবুত করে: মাশরুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি আছে। শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনে এই উপাদানগুলো অত্যন্ত কার্যকরী।

১১। মাশরুম কিডনি রোগ ও এলার্জি রোগের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে

১২। মাশরুম খেলে হাইপার টেনশন দূর হয় এবং মেরুদন্ড দৃঢ় থাকে।

১৩। হেপাটাইটিস বি ও জন্ডিস প্রতিরোধ করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

১৪। মাশরুমের খনিজ লবণ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৫.১.৪ মাশরুমের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে জমির অপ্রতুলতা, ব্যাপক বেকারত্ব, নিদারুন পুষ্টিহীনতা, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান, সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় মাশরুম একটি সম্ভাবনাময় ফসল। মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরুপ-

ক) মাশরুম একটি পুষ্টিকর (উন্নত মানের আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ), সুস্বাদু ও ঔষধিগুণসম্পন্ন সবজি।

খ) মাশরুম চাষের জন্য উর্বর জমির প্রয়োজন হয়না এবং অল্প জায়গায় অধিক পরিমাণ মাশরুম উৎপাদন করা যায়।

গ) মাশরুম চাষের জন্য বালাইনাশক এমনকি রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয়না। ফলে, মাশরুম চাষ ভূমি ও বায়ুর উপরে কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না, বরং মাশরুম চাষের পর পরিত্যক্ত স্পন প্যাকেট মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ঘ) স্বল্প পুঁজিতে মাশরুম চাষ শুরু করা যায়। তাই হত দরিদ্র ভূমিহীন মানুষও মাশরুম চাষ করতে পারেন।

ঙ) মানুষের র্কমসংস্থান/ আত্নকর্মসংস্থান বিশেষ করে বেকার, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের র্কমসংস্থানের সুযোগ করা সম্ভব।

চ) বিশ্বব্যাপী মাশরুমের ব্যাপক চাহিদা আছে।

ছ) বাংলাদেশে যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বিরাজ করে তাতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেই সারা বছর মাশরুম চাষ করা সম্ভব।

জ) উৎপাদন মাধ্যমের পর্যাপ্ততা রয়েছে যেমন- খড়, আখের ছোবড়া ও কাঠের গুড়া। এগুলো দিয়ে বিপুল পরিমাণ মাশরুম উৎপাদন সম্ভব।

ঝ) মাশরুম চাষে অল্প দিনেই ফলন পাওয়া যায় এবং লাভসহ পুঁজি ঘরে আসে। তাই, দারিদ্র্য দূরীকরণে মাশরুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২০২৫

ঞ) মাশরুম ঘরে চাষ করা হয় বিধায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাশরুমের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

৫.১.৫ মাশরুম চাষের সুবিধা ও অসুবিধা

৫.১.৫.১ সুবিধা (Advantages)

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের অত্যন্ত উপযোগী। সে সাথে চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণও (যেমন- খড়, কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়াসহ বিভিন্ন কৃষিজ ও শিল্পজ বর্জ্য) অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য।

(১) মাশরুম চাষে আবাদী জমি দরকার হয় না

(২) ঘরের মধ্যে চাষ করা যায়

(৩) তাকে তাকে সাজিয়ে একটি ঘরকে কয়েকটি ঘরের সমান ব্যবহার করা যায়

(৪) অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৭-১০ দিনের মধ্যে বীজ বা স্পন থেকে মাশরুম পাওয়া যায় যা বিশ্বের অন্য কোন ফসলের বেলায় প্রযোজ্য নয়

মাশরুম চাষে অর্থনৈতিক সুবিধা

মাশরুম চাষ একটি সর্বোত্তম লাভজনক ব্যবসা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে কোন ব্যবসা সর্বাধিক লাভজনক তখনই ধরা যাবে যখন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো সর্বোচ্চ অনুকূল অবস্থা থাকবে। যেমন-

(১) কম পুঁজির দরকার হবে।

(২) বিনিয়োগকৃত অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে তুলে আনা সম্ভব হবে এবং

(৩) অল্প শ্রমের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে।

অপরদিকে বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে:

(১) যদি একক প্রতি ফলন অধিক হয়

(২) বাজার মূল্য অধিক হয়

(৩) একক প্রতি লাভ অধিক হয়, তবে তা সর্বোত্তম ব্যবসা বটে

কেবল মাশরুমের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত সবকটি বিষয় প্রযোজ্য। তাই মাশরুম ব্যবসা মানেই সর্বোত্তম লাভজনক ব্যবসা। এছাড়া অধিক উৎপাদনের মাধ্যমে বিদেশ থেকে মাশরুম আমদানী কমিয়ে দেশী মুদ্রা সাশ্রয় হবে। আরও অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হলে বিদেশে মাশরুম রপ্তানীর মাধ্যমে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা ঘরে এনে জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

মাশরুম চাষের সামাজিক সুবিধাসমুহ

মাশরুম চাষে যে সমস্ত সামাজিক সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলো হলো-

(১) মাশরুম চাষে, সংরক্ষণে, প্রক্রিয়াজাতকরণে ও বাজারজাতকরণে কর্মহীন লোকদের নিয়োজিত করে জনগণকে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

(২) প্রচলিত সামাজিকতার কারণে শিক্ষিত হবার পর যারা রোদে পুড়ে, মাঠে কাদা মাটির সাথে মিশে নিজেদেরকে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করতে অনীহা প্রকাশ করেন, সেসমস্ত বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য মাশরুম চাষ একটি আশীর্বাদ।

২০২৫

(৩) মাশরুম এমন একটি সবজি যা চাষ করে মহিলারা আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে, সংসারের কাজকর্ম করেও অধিক উপার্জন করতে পারেন।

মাশরুম চাষে পরিবেশের সুবিধা

১। অধিকাংশ মাশরুমে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক কোনটাই ব্যবহার করতে হয়না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ উপায়ে মাশরুম উৎপাদন করা হয়। তাই মাশরুম সর্বোচ্চ পরিবেশ এবং শরীরের বান্ধব।

২। মাশরুম চাষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ কৃষি, বনজ ওশিল্পের উপজাত যেগুলোর যত্রতত্র এবং অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত করে। সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে প্রক্রিয়াজাত করে সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব। ফলে পরিবেশ অধিক দূষনমুক্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি জোর করে বলা যায় যে, মাশরুম চাষের মাধ্যমে এদেশের পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা বেকারত্বদূরীকরণ (বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি), আমদানী বিষয় হ্রাস এবং রপ্তানী আয়বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ উন্নয়নের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৫.১.৫.২ অসুবিধা

(১) সম্ভাবনাময় এ ফসলটির চাষ সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায়গুলো হলো- আমাদের খাদ্যাভ্যাসে মাশরুম না থাকা;

(২) মাশরুমের মত দেখতে ব্যাঙের ছাতার সর্বত্র উপস্থিতি যা পঁচা, স্যাতস্যাতে জায়গায় জন্মায় বিধায় মানুষকে মাশরুম খাবার হিসেবে গ্রহণে অনাগ্রহী করে তোলে;

(৩) মাশরুম খাওয়া যাবে কি যাবে না, অর্থাৎ হালাল কি হারাম এ বিষয়ে দ্বিধা;

(৪) এদেশের প্রচলিত অন্যান্য ফসলের চাষ পদ্ধতির সাথে মাশরুম চাষ পদ্ধতির মিল না থাকা এবং মাশরুম চাষে উচ্চ মূল্যের যন্ত্রপাতি ও উচ্চ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন হওয়া। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষণায় এদেশে মাশরুম চাষের উপযোগী স্বল্প খরচের যন্ত্রপাতি ও সহজ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে, তবুও এসব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক পরিচিতির অভাব রয়েছে।

৫.২ মাশরুম উৎপাদন পদ্ধতি

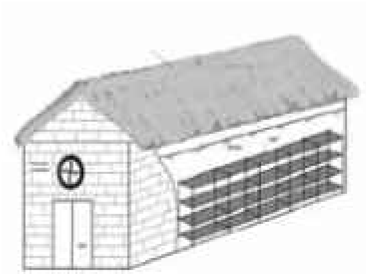
৫.২.১ বিভিন্ন ধরণের মাশরুমের চাষ ঘরের উপযোগিতা নির্ধারণ: বিভিন্ন ধরণের মাশরুম চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলো প্রয়োজন হয়। কোন জাতের মাশরুম চাষ করবে সে অনুযায়ী চাষঘরে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.২.১.১ মাশরুম চাষের প্রতিবেশ: মাশরুম চাষের জন্য মূলত ৫টি বিষয়ের উপরে নজর দিতে হবে। এ ৫টি বিষয়কে মাশরুম চাষের মূলনীতি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

১। **অক্সিজেনের উপস্থিতি:** ছত্রাক মূলতঃ কাঠের গুড়াকে পচিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় খাদ্য খায়। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে মাশরুম বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়ায় কাঠের গুড়া ভেঙ্গে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বের করে আনে, যা মাইসেলিয়াম খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। মাশরুম উৎপাদনের সময় প্রচুর

পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। অক্সিজেন না পেলে খাদ্য উৎপাদনের এ কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং মাশরুম উৎপাদন সম্ভব হয়না। তাই মাশরুম চাষ ঘরে অক্সিজেনের উপস্থিতি থাকা অতীব জরুরী।

২। কার্বনডাই-অক্সাইড বের করার ব্যবস্থা: মাশরুম খাদ্য তৈরিতে অক্সিজেন ব্যবহার করেও কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। মাশরুম চাষঘরে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বেড়ে গেলে মাশরুমের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ কার্বন ডাই অক্সাইড ভারী বিধায় প্যাকেটের চারিপাশে স্তর তৈরি করে থাকে। ফলে প্যাকেটের চারিপাশে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। তাই অক্সিজেনের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ঘর থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর এর জন্য ঘরের মধ্যে ভেন্টিলেশন অথবা ঘরের নিচের অংশ ফাঁকা অথবা একজস্ট ফ্যান লাগিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।



চিত্র:মাশরুম চাষঘর



চিত্র: চাষঘরে রাখা তাক/র‍্যাকে মাশরুম

৩। আলো:বিভিন্ন মাশরুম বিভিন্ন মাত্রার আলো পছন্দ করে। তাই মাশরুম চাষঘরে প্রয়োজনীয় মাত্রার আলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এ আলো মাশরুমের অঙ্কুর গজাতে সহায়তা করে। ওয়েষ্টার মাশরুম চাষের জন্য চাষঘর আবছা আলোযুক্ত হতে হবে, যেন একজন লোক খালি চোখে খবরের কাগজ পড়তে পারেন। মিল্কী মাশরুম চাষের জন্য চাষঘরে অনেক আলোর প্রয়োজন হয় । বাটন মাশরুম চাষের জন্য আলো না হলেও চলে।

৪। তাপমাত্রা: প্রত্যেকটি মাশরুম গজানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন। ওয়েস্টার মাশরুমের ফ্রুটিংবডি গজানোর জন্য তাপমাত্রার প্রয়োজন ২০-৩০° সেলসিয়াস। এর উর্ধ্বে অথবা নিম্নে মাশরুমের ফলন ও কোয়ালিটি দারুনভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। একই ভাবে অন্যান্য মাশরুম চাষের জন্য চাষঘরে প্রয়োজনীয়মাত্রার তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। আর্দ্রতা:মাশরুম আর্দ্র অবস্থা পছন্দ করে। প্রত্যেকটি মাশরুমের গজানোর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। ওয়েস্টার মাশরুমের জন্য এই আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭০% -৮০%। সুতরাং চাষঘরে মাশরুম প্যাকেটের চারিপাশে উচ্চ মাত্রার আর্দ্রতা বজায় রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিচর্যার মাধ্যমে উপরোক্ত মাত্রার আর্দ্রতা সহজে বজায় রাখা যায় ।

৫.২.২ বীজ প্যাকেট সংগ্রহ: মাশরুম উৎপাদন করার জন্য স্পন বা বীজের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বা বেসরকারীভাবে গড়ে ওঠা মাশরুম ফার্ম থেকে বীজ সংগ্রহ করে মাশরুম চাষ করা যাবে।

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং এখানে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ উৎপাদনের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তুলে ধরা হল।

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি ফ্লো চার্ট



পিডিএ মিডিয়া প্রস্তুত → পিওর কালচার তৈরি → মাদার কালচার তৈরি → বানিজ্যিক স্পণ

ওয়েস্টার মাশরুমের বাণিজ্যিক স্পন তৈরি: ওয়েস্টার মাশরুমের বাণিজ্যিক স্পনের কাঁচামাল হিসেবে কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়া, ধানের খড়, গমের খড়, কচুরিপানা, সুপারির ছাল, জুট তুলা প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঠের গুড়া দিয়ে অত্যন্ত সহজে স্পন তৈরি করা যায়। সবসময় ও সব পরিবেশে চাষ উপযোগী হওয়ায় নিম্নে কাঠের গুড়া দিয়ে বাণিজ্যিক স্পন তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো (৫০০ গ্রাম ওজনের ১০০ স্পন এর জন্য)

উপকরণ	পরিমাণ
কাঠের গুড়া	১৬.০ কেজি
গমের ভূষি	৮.০ কেজি
ধানের তুষ/কাটা খড়	১.০ কেজি
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	১০০ গ্রাম
পানি	২৫ লিটার

এছাড়া আধা কেজির প্যাকেটের জন্য ৭X১০এবং ১ কেজির জন্য ১০X১২সাইজের পিপি ব্যাগ, প্লাস্টিক নেক, ব্রাউন পেপার, রাবার ব্যান্ড, কটন ও একটি কাঠের কাঠির প্রয়োজন হবে।

উল্লেখিত পরিমাণ কাঠের গুড়া, গমের ভূষি, ধানের তুষ, চুন ও পানি মিক্সার মেশিনে অথবা হাতে ভালভাবে মিশাতে হবে। পিপি ব্যাগে ৫০০ গ্রাম অথবা ১ কেজি করে মিশ্রণ ভরে তাপ সহনশীল নেক ও রাবার ব্যান্ড দিয়ে পিপি ব্যাগের মুখ বাঁধতে হবে। একটি শক্ত কাঠি দিয়ে মিশ্রণ ভরা প্যাকেটের মুখে গর্ত করে নিতে হবে। কটন বল দিয়ে প্যাকেটের মুখ বন্ধ করে ব্রাউন পেপার দিয়ে ঢেকে তা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তারপর অটোক্লেভ মেশিনে ১২১° সেঃ তাপমাত্রায় ও ১.১-১.৫ কেজি/সি.মি.২ চাপে প্যাকেট গুলোকে ন্যূনতম ২ ঘন্টাকাল জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অটোক্লেভ এর পরিবর্তে ড্রামে ৪-৫ ঘন্টা রেখে জীবাণুমুক্ত করা যাবে। জীবাণুমুক্ত করার পর প্যাকেট ঠান্ডা হলে পূর্বে প্রস্তুতকৃত মাদার কালচার (প্রতি প্যাকেটে ১ চামচ পরিমাণ) দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে ক্লিনবেঞ্চ / ইনুকুলেশন বক্সের ভিতরে ইনুকুলেশন করতে হবে। মাদার কালচার দেয়ার পর প্যাকেটগুলোকে ইনকিউবেশনের জন্য গ্রোথ চেম্বারে ২০-২৫°ডিগ্রী সেঃ ২০২৫

তাপমাত্রায় রাখতে হবে। গ্রোথ চেম্বারে প্যাকেটের ভেতর সাদা মাইসেলিয়াম বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ১৮ থেকে ২৮দিনের মধ্যে প্যাকেট গুলো সম্পূর্ণ সাদা হয়ে যাবে। এই সাদা মাইসেলিয়াম পূর্ণ প্যাকেটকে বাণিজ্যিক স্পন বলে।



চিত্র: জীবানুমুক্তকরণ ও ইনকিউবেশন কক্ষ

৫.২.৩ ওয়েস্টার মাশরুমের বীজ প্যাকেট কর্তন ও স্থাপন

৫.২.৩.১ প্যাকেট কর্তন: চাষ ঘরে বসানোর পুর্বে স্পন প্যাকেট সঠিক নিয়মে কেটে চেছে পানিতে চুবিয়ে নেয়া প্রয়োজন। স্পন প্যাকেটের কোণাযুক্ত দুই কাঁধ বরাবর প্রতি কাঁধে ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি নিচে ব্যাস করে উল্টা “D" আকারে পিপি কেটে ফেলতে হবে। উভয় পার্শ্বের এই কাটা জায়গা ব্লেড দিয়ে সাদা অংশ চেছে ফেলতে হবে। এই কাটা ও চাছা প্যাকেটকে ৫-১৫ মিনিট পানিতে উপুড় করে চুবিয়ে ভালভাবে পানি ঝরিয়ে সরাসরি চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে সারি করে সাজিয়ে চাষ করতে হবে।

৫.২.৩.২ পরিচর্যা: চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে/র‍্যাকে মাশরুম স্পন থেকে স্পন এবং সারি থেকে সারি ৫ সেমি পর পর সাজিয়ে দিলে মাশরুমের ফলন ভাল হয়। স্পন প্যাকেটের চারিপাশের আর্দ্রতা ৭০% - ৮০% রাখার জন্য গরমের দিনে ৪/৫ বার, শীতে ও বর্ষায় দিনে ২/৩ বার (প্রয়োজনে কমবেশী) পানি স্প্রে করতে হবে যেন প্যাকেট ও এর আশেপাশে ভেজা ভেজা ভাব থাকে কিন্তু পানি জমে না থাকে। স্প্রে করার সময় স্প্রেয়ারের নজল প্যাকেটের ১ ফুট উপরে রেখে পানি এমনভাবে স্প্রে করতে হবে যেন কাটা জায়গার অংকুরের উপর সরাসরি পানির ফোটার আঘাতে অংকুর ভেঙ্গে না যায়। তবে পানি ভোরে সূর্য ওঠার পুর্বে এবং সূর্য ডোবার পরে স্প্রে করলে ফলন বহগুন বেড়ে যায়।



চিত্র: মাশরুমে পানি স্প্রে



চিত্র: কাঠের গুড়ার স্পন প্যাকেটে মাশরুম

মাশরুম চাষের অন্যান্য পরিচর্যা হচ্ছে —

মাশরুম ঘরের চারপাশ সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কারণ মাশরুম একটি স্পর্শকাতর সবজি।

ক) পরিচর্যা ঠিক হচ্ছে কিনা তা বোঝার উপায় হচ্ছে ২-৩ দিনের মধ্যে মাশরুমের অংকুর পিনের মত বের হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যে মাশরুম তোলার উপযোগী হবে।

খ) যদি এক সাথে অনেকগুলো অংকুর আসে তবে সম আকারের মানসম্পন্ন মাশরুম পাওয়ার জন্য নিচের ছোট অংকুর গুলি ধারালো সারজিক্যাল ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলতে হবে এবং প্রতি পাশের থোকায় ৮ থেকে ১২টি ফ্রুটিং বডি (৫০০ গ্রাম প্যাকেটে) রাখতে হবে।

গ) প্রথমবার মাশরুম তোলার পর প্যাকেট ১ দিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হবে এবং পরের দিন পুর্বের কাটা অংশে পুনরায় চেছে ফেলে পুর্বের ন্যায় পানি স্প্রে করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে প্যাকেট যেন গর্ত না হয়।

ঘ) ২য় বার মাশরুম সংগ্রহ করা যাবে ১০ - ১৫ দিন পর ।

ঙ)একইভাবে ১ টি প্যাকেট থেকে ৫/৬ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়, তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য ২/৩ বার সংগ্রহ করা উচিত। এতে একটি প্যাকেট থেকে নূন্যতম ২০০-২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে।

চ) মানসম্মত মাশরুম পাওয়ার জন্য এবং বেশী সময় স্বাভাবিক অবস্থায় মাশরুম সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহের পূর্বে অন্তত ১২-১৫ ঘন্টার মধ্যে মাশরুমের গায়ে সরাসরি পানি স্প্রে করা যাবে না।

ছ) ১টি প্যাকেট থেকে ৭৫ দিন থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত ভালোভাবে মাশরুম পাওয়া যায় (প্যাকেট যতদিন সাদা থাকে)।

জ)মাশরুম উৎপাদন শেষ হলে প্যাকেট চাষ ঘর থেকে সরিয়ে পি.পি খুলে পঁচা কাঠের গুড়ার কম্পোস্ট একটি গর্তের মধ্যে রেখে কম্পোষ্ট তৈরী করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা যাবে।



অংকুর বা পিনহেড



মিডিয়াম স্টেজ মাশরুম



সংগ্রহোপযোগী মাশরুম

৫.৩ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

৫.৩.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ ও জৈব উপায়ে মাশরুম উৎপাদন করা হয়। তাই মাশরুম সর্বোচ্চ পরিবেশ বান্ধব।

৫.৩.২ মাশরুমের বালাই: মাশরুমের বালাই বলতে এমন সব জীবন্ত বস্তুকে বোঝায় যা চাষ করা মাশরুম নষ্ট করে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক অংশে কমিয়ে এবং মাশরুম এর গুনগত মান নষ্ট করে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে চাষ করলে মাশরুম সাধারণতঃ কোন রোগ-বালাই কিংবা পোকা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তবে অপরিচ্ছন্ন হলে কখনও কখনও বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের যেমন- (১) বিভিন্ন ধরণের মাছি (স্ক্যারিড, ফোরিড, সেসিড ও লেপটোসেরা) (২) মাইট, (৩) উইভিল, (৪) স্প্রিং টেইলস (৫) পিপড়া, (৬) তেলাপোকা, (৭) ইঁদুর ইত্যাদি মাশরুমের ক্ষতি করতে পারে। এ সকল পোকা মাকড় শুরু থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত মাশরুমের বিভিন্ন ক্ষতি করে থাকে। মাশরুম চাষের জন্য যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা হয় তা পোকামাকড়ের বংশ বিস্তার ও সক্রিয়তা বৃদ্ধির উপযোগী। এ কারণে চাষীর বাড়িতে মাশরুম চাষের সময় পোকা মাকড়ের অনুপ্রবেশ ও বংশবিস্তার খুব সহজেই ঘটে। নিম্নে এদের ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হল

৫.৩.২.১ পোকামাকড়

১। মাছি

ক) স্ক্যারিড মাছি: এই মাছি সরাসরি ওকীড়া অবস্থায় মাশরুমের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এর কীড়াগুলির মাথা কালো রঙের বলে সহজে চেনা যায়। পিনহেড বা ছোট স্ট্রেজে এই মাছি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। এর কীড়া পিনহেডের ভিতরে ঢুকে এর নরম টিস্যু গুলো খেয়ে ফেলে। এছাড়া এমাছি অন্যান্য ছত্রাকের বাহক হিসেবে কাজ করে বিধায় এর মাধ্যমে ছত্রাক জাতীয় রোগ ছড়ায়।

খ) ফোরিড মাছি: এর কীড়ার মাথায় কোন কালো দাগ থাকেনা। এই মাছির কীড়া মাশরুমের সাদা মাইসিলিয়াম খেয়ে ফেলে যে কারণে মাশরুমের পিনহেড বের হতে পারে না, বর্ষাকাল ও শরৎকালে এর আক্রমণ বেশি হয়। তবে স্ক্যারিড মাছির মত কোন ক্ষতিকর ছত্রাক বহন করে না।

এক নজরে মাছি মাশরুম চাষে যে সব সমস্যার সৃষ্টি করে:

- মাশরুমের উৎপাদন কমিয়ে দেয়
- কম্পোষ্ট নষ্ট করে ফেলে
- প্যাকেটের মাইসেলিয়াম খেয়ে ফেলে
- রোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে রোগ বিস্তার করে।
- পরিচর্যাকারীর বিরক্তির কারণ হয়।
- মাশরুমের গুণগত মান নষ্ট করে বাজার মূল্য কমিয়ে দেয়।

সুতরাং মাছির ব্যবস্থাপনা মাশরুম চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১) মাছি পোকার ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে চাষ ঘরের চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। এক্ষেত্রে মাশরুম ঘরের জানালা দরজায় নেট ব্যবহার করে প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া ঘরের চারপাশে নিমের পাতাসহ ডাল রেখে মাছির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- মাছি মারার ফাঁদ বানিয়েও মাছি দমন করা যায়। এক্ষেত্রে একটি পাত্রে অথবা পানির বোতল কেটে ১০০ গ্রাম মাশরুম কুচি কুচি করে কেটে তার সাথে ১০ ফোটা ডিপট্যারেক্স অথবা অন্য যে কোন কম গন্ধের কীটনাশক মিশিয়ে ঘরের ভিতর রেখে দিলে এর গন্ধে মাছি আকৃষ্ট হয়ে খেতে যাবে এবং মারা পড়বে।

- মাশরুম চাষ ঘরের র‍্যাকে হলুদ রংগের আঠাযুক্ত কাগজ মুড়ে রাখলে হলুদ রঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে মাছি কাছে আসে ও আঠায় আটকে যায় এভাবে পুর্ণাঙ্গ মাছি দমন করা যায়।
- বর্ষার সময় মাশরুমের মধ্যে অথবা কাটা জায়গায় মাছির কীড়া নড়াচড়া করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্যাকেটের ভেজা নরম কাঠের গুড়া গুলো চেছে পুড়িয়ে ফেলে এক/দুই দিন পানি স্প্রে বন্ধ রাখলে এবং সেই সাথে মাছি পোকা প্রতিরোধের উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করলে সহজে এ সমস্যা দূর করা যায়।

৫) পিপড়া: পিপড়া মাশরুমের স্পন প্যাকেট ছিদ্র করে এবং মাশরুমের রস চুষে খায় যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া থেকে সহজে মাশরুমকে আক্রমণ করে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: চাষ ঘরের চারপাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ফিনিস পাউডার (কীটনাশক) ঘরের চারপাশে ও তাকের পিলারের চারপাশে ছিটিয়ে দিতে হবে। মাশরুম র‍্যাক জল কান্দাতে বসালে পিপড়া নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৬) তেলাপোকা: তেলাপোকা পিনহেড থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মাশরুম কেটে খায়। তেলাপোকা মাশরুমের গুনগতমান সহ ফলন কমিয়ে দেয়।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: ম্যাজিক চক তাকের বিভিন্ন জায়গায়, দেয়ালে এবং পিলারের চারপাশে দাগ কেটে দিয়ে তেলাপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া পিটিয়ে মেরেও তেলাপোকা দমন করা যায়। বাজারে নকরোচ নামক কীটনাশক তাকের চারপাশে ছিটিয়ে দিয়ে তেলাপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭) ইঁদুর: ইদুর স্পন প্যাকেট কেটে নষ্ট করে। তাছাড়া পিনহেড থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মাশরুম কেটে ফেলে এবং ফলন কমিয়ে দেয়।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: মাশরুম ঘরের নিচ দিয়ে নেট, ইঁদুর মারা ফাঁদ ও ইঁদুর নাশক ঔষধ ব্যবহার করে এ ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

৫.৩.২.২ রোগ: মাশরুম অত্যন্ত বিশুদ্ধ উপায়ে তৈরি হয় বলে রোগব্যাধি খুবই কম হয়। তবে মাশরুমের স্পন প্যাকেট যদি সম্পূর্ণরূপে জীবানুমুক্ত না হয় তাহলে প্যাকেটে রোগ ব্যাধির সংক্রামন হতে পারে। এছাড়া চাষঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে অথবা বিশুদ্ধ পানি স্প্রে না করলে অথবা জীবাণুবাহী পোকামাকড় মাশরুমে আক্রমণ করলে অনেক সময় মাশরুমে বিভিন্ন রোগব্যাধির আক্রমণ দেখা দেয়। রোগব্যাধির আক্রমণ চেনার সহজ উপায় হচ্ছে মাশরুম পচে যাওয়া, কাটা জায়গায় সাদা তুলার মত হওয়া, অথবা কাটা জায়গায় সবুজ বা কালো হয়ে যাওয়া। এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হলে সরাসরি মাশরুম বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মাশরুম অল্প দিনে জীবন চক্র সম্পন্ন করে বলে এর বালাই ব্যবস্থাপনা খুব কঠিন। তাই কম খরচে সময়মত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন অতীব জরুরী। বালাই ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা হলে মাশরুমের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৫.৪ মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

৫.৪.১ মাশরুম সংগ্রহ প্রণালী

৫.৪.১.১ মাশরুম সংগ্রহের সময়: যথাসময়ে/ সঠিক সময়ে মাশরুম সংগ্রহ করতে পারলে মাশরুমের সংরক্ষণকাল বেড়ে যায় এবং চাষী লাভবান হয়।

ক) ওয়েষ্টার - মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের শিরাগুলো ঢিলা হয়নি অথবা কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

খ) মিল্কি হোয়াইট - এ মাশরুমের সংরক্ষণকাল সবচেয়ে বেশী সাধারণ রুম তাপমাত্রায় একে ৪-৫ দিন সংরক্ষণ করা যায় । এর সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হলো মাশরুমের আকার প্রায় ৪-৫ ইঞ্চি হবে এবং মাশরুম যথেষ্ট রসালো থাকেবে। এ সময় সংগ্রহ করলে প্যাকেটে মাশরুমের পরিমাণ বেশি পাওয়া যাবে এবং মাশরুমের বাজার মূল্য বেড়ে যাবে।

গ) স্ট্র মাশরুম সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, এর সংরক্ষণকাল ২৪ ঘন্টারও কম। মাশরুমের ক্যাপ ফোটে যায়নি অথাৎ বাটন/এগ অবস্থায় সংগ্রহ করা উপযুক্ত সময়।

৫.৪.১.২ মাশরুম সংগ্রহ কৌশল

১) চাষঘরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত থাকলে মাশরুম সংগ্রহ করা উচিত নয়, সেজন্য সকালে অথবা বিকেলে মাশরুম সংগ্রহ করা উচিত।

২) এক হাতে প্যাকেট ধরে অন্য হাতের পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে আলতো মোচড় দিয়ে মাশরুম তুলে নিতে হবে।

৩) সংগৃহীত মাশরুমের গোড়ার ময়লা অংশ কেটে পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং গ্রেডিং করতে হবে।

৪) গ্রেড অনুযায়ী মাশরুম গুলোকে ০.২-০.২৫ মিঃ মিঃ পুরুত্বের পিপি ব্যাগে ভরে সিলিং করে বাজারজাত করতে হবে।

৫) এবং তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।



চিত্র: মাশরুম প্যাকেজিং

৫.৪.২ মাশরুম সংরক্ষণ প্রণালী

৫.৪.২.১ মাশরুম কেন সংরক্ষণ করা উচিত:

তাজা মাশরুমে পানির পরিমান বেশী থাকায় এর সংরক্ষণকাল খুবই কম। মাশরুম তুলে আনার পরপরই এর রং এবং গঠনের দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করলে রং ও গঠন ঠিক রেখে বেশীদিন ব্যবহার করা যায়। তাই মাশরুম ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হলে কিছু বিষয় সব সময় মেনে চলতে হবে। যেমন-

- মাশরুম সঠিক সময়ে অথাৎ পরিপক্ক অবস্থায় তুলতে হবে।
- যথা নিয়মে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সংরক্ষণ অবশ্যই ঠান্ডা বায়ুরোধী অবস্থায় করতে হবে।

৫.৪.২.২ তাজা মাশরুম সংরক্ষণ

- তাজা মাশরুম তোলার ১২ ঘন্টা পুর্বে সরাসরি গায়ে পানি স্প্রে না করলে সেই মাশরুম তুলে, কেটে গ্রেডিং করে পিপি ব্যাগের মধ্যে সিলিং করে ঘরে ঠান্ডা জায়গায় ২ থেকে ৩দিন রেখে খাওয়া যায়।
- রেফ্রিজারেটরের মধ্যে নরমাল চেম্বারে (১০ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায়) সিলিং অবস্থায় ৭/৮দিন রেখে খাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে প্যাকেটটি রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে একবারেই পুরো প্যাকেটের মাশরুম খেয়ে ফেলতে হবে। তাই প্যাকেট করার সময় পারিবারিক প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট ছোট প্যাকেট করা উচিত।
- বাসাবাড়িতে দীর্ঘদিন রেখে খাওয়ার জন্য ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২থেকে ৩ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে টিফিন বক্সে অথবা ঢাকনাযুক্ত কৌটায় ডিপ ফ্রীজের মধ্যে ৫ থেকে ৬মাস রাখা যাবে।
- এছাড়া মাশরুম ব্লানচিং করে লবণ দ্রবণে ৫-৬ মাস রেখে খাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ব্লানচিং করার পদ্ধতি হচ্ছে ২% ফুটন্ত লবণ পানিতে ২ থেকে ৫ মিনিট মাশরুম সিদ্ধ করে বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে ২% লবণ (সোডিয়াম/পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট) ও ১% সাইট্রিক এসিড মিশ্রিত লবণ দ্রবণে বায়ুরোধী করে জীবাণুমুক্ত করার পর ঠান্ডা করে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

৫.৪.২.৩ মাশরুম ক্যানিং: এই পদ্ধতিতে মাশরুম এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। বিদেশের বাজারে মাশরুম রপ্তানী করতে হলে ক্যানিং পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো।

৫.৪.২.৪ শুকনা মাশরুম সংরক্ষণ: মাশরুম শুকিয়ে এবং শুকনো মাশরুম পাউডার করে বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়। মাশরুম রোদে, ডিহাইড্রেশন পদ্ধতিতে অথবা ইলেকট্রিক ড্রায়ারে শুকিয়ে এয়ার টাইট প্যাকেটে ৫-৬ মাস রেখে সংরক্ষণ করা যায়। শুকনা মাশরুম ব্লেন্ডার মেশিনে পাউডার করে এয়ার টাইট প্যাকেটে রেখে একই ভাবে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।



চিত্র: ইলেকট্রিক ড্রায়ার

৫.৪.২.৫ মাশরুমের রন্ধন প্রণালী / ব্যবহার পদ্ধতি/ মাশরুম রান্নার মাধ্যমে সংরক্ষণ

মাশরুম এমন একটি সবজি যা বিভিন্নভাবে খাবার তৈরি করে খাওযা যায়। মাশরুম দিয়ে চাইনিজ ও স্টার হোটেল গুলোতে বিভিন্ন প্রকার মুখরোচক খাবার তৈরি করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশীয় পদ্ধতিতে মাশরুম দিয়ে নানা রকম খাবার যেমন- মাশরুম সবজি, মাশরুম চিকেন স্যুপ, চিংড়ি মাশরুম, মাশরুম ফ্রাই, মাশরুম চিকেন বিরিয়ানী, ছোট মাছের সাথে মাশরুম, মাশরুম পোলাও, মাশরুম নুডুলস ইত্যাদি তৈরি করা যায়। অর্থাৎ প্রায় যে কোন খাবার মাশরুম দিয়ে রান্না করা যায়।তাজা, শুকনা ও পাউডার তিনভাবে মাশরুম খাওয়া

যায় তবে শুকনা মাশরুম ব্যবহারের পূর্বে ১০-১৫ মিনিট গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পাউডার মাশরুম দিয়ে চা, কফি, মিষ্টিজাতীয় দ্রব্যাদি, সকালের রুটির আটায় এমনকি তরকারীতে হলুদ, মরিচের গুড়ার মত ব্যবহার করা যায়। এছাড়া আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি তৈরি করেও সংরক্ষণ করা যায়।

মাশরুম ক্রিসপি (দশ জনের জন্য):

উপকরণঃ মাশরুম- ২০/২৫ টি (২০০ গ্রাম), আটা- ৪ কাপ, লবণ- পরিমাণ মত, হলুদ গুড়ো- ১/২ চা চামচ, মরিচ গুড়ো- ১চা চামচ, জিরার গুড়া – ১/৪ চা চামচ, গোল মরিচের গুড়া- ১/৪ চা চামচ, সয়াবিন তৈল – ১ কাপ ও পানি - পরিমাণ মত।

প্রণালী: ১) প্রথমে তাজা মাশরুম লম্বালম্বা করে চিরে নিতে হবে।

২) পাতলা ধরনের মাশরুম হলে বেশি ভালো হয়।

৩) গোলমরিচ গুড়াবাদে আটাসহ উপরোক্ত সকল উপকরণ মিশিয়ে পাতলা করে গোলা তৈরী করে নিতে হবে।

৪) উপরোক্ত গোলায় মাশরুম ডুবিয়ে নিতে হবে।

৫) অতঃপর ডুবানো মাশরুম গোলমরিচ ও লবণ মিশ্রিত আটায় গড়িয়ে নিয়ে ডুবা তেলে ভাজতে হবে।

৬) বাদামী বর্ণ ধারণ করলে নামিয়ে নিতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১) বাংলাদেশে বানিজ্যিকভবে সাত ধরণের মাশরুম চাষ হয়।

২) মাশরুম এমন একটি সবজি যা বিভিন্নভাবে খাবার তৈরি করে খাওযা যায়।

৩) তাজা, শুকনা ও পাউডার তিনভাবে মাশরুম খাওয়া যায়।

৪) মাশরুমের প্রোটিন হল অত্যন্ত উন্নত, সর্ম্পূণ এবং নির্দোষ মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় ৯টি এমাইনো এসিড সবগুলোই মাশরুমে আছে।

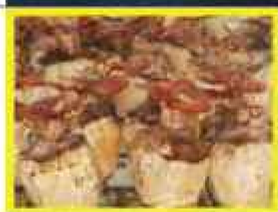
৫) মাশরুম নিজের খাদ্য তৈরীতে অক্সিজেন ব্যবহার করে ও কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

৬) স্পন প্যাকেটের চারিপাশের আর্দ্রতা ৭০% - ৮০% রাখার জন্য গরমের দিনে ৪/৫ বার, শীতে ও বর্ষায় দিনে ২/৩ বার (প্রয়োজনে কমবেশী) পানি স্প্রে করতে হবে।

৭) মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি মাশরুমের বিভিন্ন জাত সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি জাতের উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে জাতের নাম, বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন মৌসুম ও ব্যবহার উল্লেখ কর।

ক্রমিক নং	ছবি	জাতের নাম ও বৈশিষ্ট্য	উৎপাদন মৌসুম	ব্যবহার
০১				
০২				
০৩				
০৪				
০৫				
০৬				

২০২৫

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতোমধ্যে তুমি মাশরুম চাষের প্রতিবেশ সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার বাড়িতে মাশরুম চাষের পরিকল্পনা করেছ। তুমি সফলভাবে মাশরুম চাষ করতে কিকি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।

অথবা

তুমি তোমার এলাকায় সরেজমিনে একটি মাশরুম ফার্ম পরিদর্শনপূর্বক নিম্নলিখিত প্রশ্নের আলোকে মাশরুম চাষের আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

ক) ফার্মের নাম ও ঠিকানা

খ) উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ যেমন তাজা মাশরুম, শুকনা মাশরুম, স্পন প্যাকেট, আচার, ক্যাপসুল ইত্যাদি

গ) স্পন প্যাকেট প্রাপ্তির উৎস যেমন নিজে/ সরকারী প্রতিষ্ঠান/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

ঘ) কোথা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

ঙ) স্পন প্যাকেট তৈরির যন্ত্রপাতি ও চাষঘরের বর্ননা

চ) কোথায় বাজারজাত করেন

ছ) কতজন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কয় ধরণের মাশরুম চাষ করা হয়
২। বীজ উৎপাদনের ধাপ কয়টি?
৩। দিনে কতবার পানি স্প্রে করতে হয়
৪। বানিজ্যিক স্পণ তৈরির মূল উপকরণ কি?
৫। কয়ভাবে মাশরুম ব্যবহার করা যায়।
৬। বিশ্বের নামকরা মাশরুমের নাম কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর।
২। মাশরুম চাষের প্রতিবেশ উল্লেখ কর।
৩। কিভাবে স্পণ প্যাকেট কর্তন করা হয়।
৪। মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি লিখ

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। প্যাকেট কর্তন ও পরিচর্যা সম্পর্কে লিখ
২। কাঠের গুড়ায় স্পণ প্যাকেট উৎপাদন পদ্ধতি বর্ননা কর।
৩। ছবিসহ মাশরমের গঠন বর্ননা কর
৪। বালাই কি? মাশরুমের ৫টি বালাই সম্পর্কে লিখ।
৫। মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণ সম্পর্কে লিখ

জব ৫.১ মাশরুম চাষে দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- মাশরুম চাষের উপযোগী ঘর ও তাক তৈরি করতে পারবে।
- মাশরুমের স্পন প্যাকেট সংগ্রহ , কর্তন ও স্থাপন করতে পারবে
- অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- বালাই দমন করতে পারবে
- মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে

পারদর্শীতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুত করা
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
৩. মাশরুম চাষঘর ও তাক তৈরির সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করা
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেওয়া

ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১	হ্যান্ড গ্লাভস		
২	এপ্রোন		
৩	সেফটি গগলস		
৪	গামবুট		
৫	সেফটি মাস্ক		

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী: মাশরুম ঘরের ফসল কারণ উচচ আর্দ্রতা সম্পন্ন ও ছায়াযুক্ত স্থানে এটি চাষ হয়। এটি চাষের জন্য কোন আবাদি জমি দরকার হয়না। ভিন্ন ধরণের মাশরুম চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলো প্রয়োজন হয়। কোন জাতের মাশরুম চাষ করবে সে অনুযায়ী চাষঘরে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। মাশরুম চাষের জন্য মূলত ৫টি বিষয়ের উপরে নজর দিতে হবে। এ ৫টি বিষয়কে মাশরুম চাষের মূলনীতি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

মাশরুম: ওয়েস্টার মাশরুম

চাষঘর: মাশরুম চাষের ৫টি মূলনীতিকে অনুসরন করে কাঠ, বাঁশ, লোহা, টিন, ছন দিয়ে ঘর তৈরি করতে হবে। পাকা ঘর তৈরি করা যেতে পারে। আবার ৫টি মূলনীতিকে অনুসরন করে বিদ্যমান ঘরেও চাষ করা যেতে পারে।

ঘর: প্রতিদিন ৫-৬ কেজি ওয়েস্টার মাশরুম উৎপাদনের জন্য ২২ ফুট**X**১২ ফুট ঘর তৈরি করতে হবে। ২০২৫

তাক: কাঠ, বাঁশ, লোহা, পিভিসি পাইপ দিয়ে ১০ ফুটX২.৫ফুট মাপের ৪টি তাক তৈরি করতে হবে।
যন্ত্রপাতি ও উপকরণ: কাঠ/ বাঁশ/ লোহা, টিন/ ছন/ ইট, ব্লেড, বালতি, স্প্রে মেশিন
মানসম্মত বীজ: সরকারী / সেরকারী নির্ভযোগ্য প্রতিষ্ঠানহতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

ভাল/ মানসম্মত বীজের বৈশিষ্ট্য

- প্যাকেট সাদা মাইসেলিয়ামে পরিপূর্ণ থাকবে
- প্যাকেট টাইট হতে হবে।
- প্যাকেটের গায়ে জাতের নাম ও তারিখ লিখা থাকবে।

কাজের ধারা: ১) অক্সিজেন প্রবেশ/ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে, কার্বনডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন, উপযুক্ত আলো, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিশ্চিতকরণ করা যাবে এমন জায়গা চাষঘর হিসাবে নির্বাচন করতে হবে।

২) সরকারী মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টটিউিট বা বেসরকারীভাবে গড়ে ওঠা মাশরুম র্ফাম থেকে বীজ সংগ্রহ করে

৩) স্পন প্যাকেটের কোণাযুক্ত দুই কাঁধ বরাবর প্রতি কাঁধে ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১ ইঞ্চি নিচে ব্যাস করে উল্টা "D" আকারে পিপি কেটে ফেলতে হবে। উভয় পার্শ্বের এই কাটা জায়গা ব্লেড দিয়ে সাদা অংশ চেছে ফেলতে হবে। এই কাটা ও চাছা প্যাকেটকে ৫-১৫ মিনিট পানিতে উপুড় করে চুবিয়ে ভালভাবে পানি ঝরিয়ে সরাসরি চাষ ঘরের মেঝে অথবা তাকে সারি করে সাজিয়ে চাষ করতে হবে।

৪) প্যাকেটগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মাশরম বের হওয়ার পর একপাশের মাশরুমের সাথে অপরপাশে স্পর্শ না লাগে।

৫) স্পন প্যাকেটের চারিপাশের আর্দ্রতা ৭০% - ৮০% রাখার জন্য গরমের দিনে ৪/৫ বার, শীতে ও বর্ষায় দিনে ২/৩ বার (প্রয়োজনে কমবেশী) পানি স্প্রে করতে হবে যেন প্যাকেট ও এর আশেপাশে ভেজা ভেজা ভাব থাকে।

৬) জাতভেদে প্যাকেট কাটার ২-৩ দিনের মধ্যে মাশরুমের অংকুর পিনের মত বের হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যে মাশরুম তোলার উপযোগী হবে।

৭)মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু মাশরুম পিলিয়াসের শিরাগুলো ঢিলা হয়নি অথবা কিনারা পাতলা হয়ে ফেটে যায়নি এমতাবস্থায় মাশরুম সংগ্রহ করতে হবে।

৮) প্রথমবার মাশরুম তোলার পর প্যাকেট ১ দিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হবে এবং পরের দিন পূর্বের কাটা অংশে পুনরায় চেছে ফেলে পূর্বের ন্যায় পানি স্প্রে করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে প্যাকেট যেন গর্ত না হয়।

৯) ১০ - ১৫ দিন পর ২য় বার মাশরুম সংগ্রহ করা যাবে।

১০) একইভাবে ১ টি প্যাকেট থেকে ৫/৬ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়, তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য ২/৩ বার সংগ্রহ করা উচিত। এতে একটি প্যাকেট থেকে নূন্যতম ২০০-২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে।

কাজের সতর্কতা

১) প্যাকেট সাবধানে পরিবহন করতে হবে।

২) সঠিক নিয়মে কাটতে হবে।

৩) সুষ্ঠ পরিচর্যা করতে হবে।

৪) পানি স্প্রে করার স্প্রে নজল কমপক্ষে ১ ফুট দূরে রেখে স্প্রে করতে হবে।

৫) মাশরুম সংগ্রহ করার ১২-১৮ ঘন্টা পূর্বে পানি স্প্রে বন্ধ করতে হবে।

৬) পরিছন্ন চাষাবাদ করতে হবে যাতে পোকার আক্রমণ না হয়।

৭) পোকামাকড় দেখা গেলে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা

মাশরুম চাষ করার সফলতা অর্জন করেছ।

ফলাফল

আশাকরি বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ করতে পারবে।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।